কাঙ্ক্ষা মিটিতে পারিত, তবে তো কোনো গোলই থাকিত না! দুঃখের বিষয় এই যে, সেরূপ আত্মজ্ঞানে কোনো তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তিরই আকাঙ্ক্ষা মিটিতে পারে না। আকাঙ্ক্ষা মিটিতে পারে না কেন? না, যেহেতু সেরূপ আত্মজ্ঞানে শুদ্ধকেবল আত্মার সত্তামাত্রের প্রতি লক্ষ্য করা হয়; তা বই, আত্মার আর-যে-দুইটি ভাব সেই সত্তার সঙ্গাশ্রিত, সে দুইটি ভাবের প্রতি আদবেই ভ্রূক্ষেপ করা হয় না। সে দুইটি ভাব কি? জ্ঞানের দিক্ দিয়া দেখিলে সে দুইটি ভাব হ'চ্চে আত্মার (১) জ্ঞানক্রিয়া এবং (২) জ্ঞেয় ভাব; কার্য্যের দিক্ দিয়া দেখিলে সে দুইটি ভাব হ'চ্চে আত্মার (১) শক্তিস্ফূর্ত্তি এবং (২) গুণপ্রকাশ। আত্মার শক্তি এবং গুণের প্রতি কিছুমাত্র দৃক্‌পাত না করিয়া শুদ্ধকেবল আত্মার সংজ্ঞা-নির্ব্বাচনকেই কিছু আর আত্মজ্ঞান বলা যাইতে পারে না। আত্মার সংজ্ঞা-নির্ব্বাচন খুবই সহজ—"যিনি জানিতেছেন তিনি আত্মা" এইমাত্র। "যিনি জানিতেছেন তিনি আত্মা" এইরূপে আমি আত্মাকে সংজ্ঞিত করিলাম, কিন্তু যিনি জানিতেছেন তিনি কিরূপ পদার্থ—কিরূপেই বা তাঁহাকে জ্ঞানে উপলব্ধি করা সম্ভবে—তাহা জানিলাম না, এরূপ আত্মজ্ঞান নিতান্তই অঙ্গহীন, তাহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে। পক্ষান্তরে, সাধক যখন আত্মশক্তি খাটাইয়া আপনাকে আপনার জ্ঞানগোচরে আনয়ন করেন, তখন তিনি আত্মাকে জ্ঞানের কর্ত্তা জ্ঞাতা, জ্ঞানের লক্ষ্য জ্ঞেয় এবং জ্ঞানের ক্রিয়া জ্ঞানক্রিয়া, এই তিন ভাবে একসঙ্গে উপলব্ধি করেন; আত্মার কোনো মর্ম্মাশ্রিত ভাবকেই তাহার ন্যায্য অধিকার হইতে দূরে সরাইয়া রাখেন না। এইরূপ সর্ব্বাঙ্গীন আত্মজ্ঞানই—গোটা আত্মজ্ঞানই—প্রকৃত আত্মজ্ঞান। তাহারও পরের কথা এই যে, সর্ব্বাঙ্গীন আত্মজ্ঞানেও সাধকের মনের চাঞ্চল্য, সংশয় এবং তজ্জনিত কষ্ট দূর হয় না—যতক্ষণ না তাঁহার সেই স্বশক্তিসম্ভূত আত্মজ্ঞান সর্ব্বমূলাধার বাস্তবিক সত্যের অবলম্বন পায়; কিন্তু সে কথা পরে আসিবে। আপাতত ভাব-জগতের ঐরূপ সর্ব্বাঙ্গীন আত্মজ্ঞান হইতে কতকগুলি প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহ করা চাই; তাহাতেই অন্বেষণচেষ্টা নিয়োগ করা বিধেয়।

ভাব-জগতের সর্ব্বাঙ্গীন আত্মজ্ঞান হইতে আমরা প্রধান যে-চারিটি বিষয় সংগ্রহ করিয়া পাইতেছি, তাহা ক্রমান্বয়ে এই ঃ—

(১) আত্মার সত্তা।
(২) আত্মার শক্তিস্ফূর্ত্তি।
(৩) আত্মার গুণপ্রকাশ।
(৪) আত্মার গুণপ্রকাশে আত্মার উপলব্ধি।

এই চারিটি বিষয়। এতদ্ব্যতীত ঐ চারিটি বিষয়ের পরস্পরাধীন সম্বন্ধ হইতে (অথবা যাহা আরো ঠিক্—একাত্মভাব হইতে) আরেকটি বিষয় পাইতেছি; তাহা এই যে, আত্মার সত্তা যাহা সাধনের পূর্ব্বে জ্ঞাতৃস্থানে অব্যক্ত থাকে, সাধনের পথ দিয়া তাহাই জ্ঞেয়স্থানে ব্যক্ত হয়; তাহা যখন হয়, তখন আত্মার শক্তিস্ফূর্ত্তি এবং গুণপ্রকাশ দুইই সেই সত্তার সহিত ওতপ্রোতভাবে একযোগে ব্যক্ত হয়। এইরূপ যখন কর্ত্তা-কর্ম্ম-ক্রিয়া-সমন্বিত সমগ্র আত্মা জ্ঞেয়স্থানে ব্যক্ত হ'ন, তখন সেইরূপ ব্যক্ত হওয়ার নামই সমগ্র আত্মজ্ঞান, এবং তাহা আত্মশক্তিরই ফলস্বরূপ। এই স্থানটিতে একটি সোজা কথা গোঁলোকধাঁদার ন্যায় বিষম এক পাকচক্রময় জটিল এবং দুরূহ আকার ধারণ করে। কথাটি হ'চ্চে—

আত্মসত্তা, আত্মশক্তি এবং আত্মজ্ঞান, তিনের মধ্যে ভেদাভেদ-সম্বন্ধ। একসঙ্গে অভেদ এবং প্রভেদ বুঝাও কঠিন—বুঝানোও কঠিন। পক্ষান্তরে, যদি অভেদ এবং প্রভেদ এই দুই সম্বন্ধকে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া বুঝিতে এবং বুঝাইতে যাওয়া যায়, তাহা হইলে আর-এক বিপদ্ উপস্থিত হয়;—(১) অভেদসম্বন্ধ পৃথক্‌রূপে আলোচনা করিতে গেলে প্রভেদের পথ একেবারেই অবরুদ্ধ হইয়া যায়। প্রভেদ সম্বন্ধ পৃথকরূপে আলোচনা করিতে গেলে অভেদের পথ একেবারেই অবরুদ্ধ হইয়া যায়। জানিয়া-শুনিয়া আমি এক্ষণে এই অপরিহার্য্য বিপদ্‌টিকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইতেছি;—প্রথমে—আত্মসত্তা, আত্মশক্তি এবং আত্মজ্ঞান তিনের মধ্যে অভেদ কিরূপ এবং তাহার পরে তিনের মধ্যে প্রভেদ কিরূপ;—পৃথক্ পৃথক্ রূপে এই দুইটি বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতেছি। যাহার যখন তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইব তাহারই দিকে তখন সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত চলিয়া পড়িব, তাহা আমি জানি; আর সেই কারণে অপর পক্ষের কোপে পড়িব তাহাও আমি জানি; জানিয়াও, আমি ফাঁদে পা না দিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিতেছি না। ইহার কারণ যদি জিজ্ঞাসা কর, তবে তাহা এই যে, আমি দেখিয়া-শেখা অপেক্ষা ঠেকিয়া-শেখা পছন্দ করি। আমার এইরূপ বিশ্বাস যে, যাহা ঠেকিয়া শেখা যায়, তাহা যেমন মনোমধ্যে পাকা-পোক্ত-রকমে বদ্ধমূল হয়—দেখিয়া-শেখা জিনিষ কখনই তেমনটি হয় না। অতএব প্রথমে প্রভেদের কথা দূরে সরাইয়া রাখিয়া—জ্ঞান এবং সত্তার মধ্যে অভেদ কিরূপ, তাহা দেখা যা'ক্।

সম্যক্ জ্ঞান সত্তা হইতে তিলমাত্রও পৃথক্ নহে—সম্যক্ জ্ঞান এবং সত্তা একই। যদি বল যে, জ্ঞান এবং সত্তা পরস্পর হইতে ভিন্ন, তবে আমি বলিব যে, যে-অংশে জ্ঞান সত্তা হইতে ভিন্ন, সে অংশে তাহা জ্ঞান নহে। যদি হাতী হাতিরূপে প্রকাশ পায়, তবে তাহারি নাম হস্তিবিষয়ক জ্ঞান; পক্ষান্তরে, যদি হাতী ঘোড়ারূপে প্রকাশ পায়, তাহার নাম হস্তিবিষয়ক অজ্ঞান বা ভ্রম। তবেই হইতেছে যে, জ্ঞেয় বস্তুর প্রকাশ যে-অংশে জ্ঞেয় বস্তুর সহিত অভিন্নরূপী, সেই অংশেই তাহা জ্ঞাননামের যোগ্য। ইহা হইতে আসিতেছে এই যে, জ্ঞেয় বস্তুর প্রকাশ যদি জ্ঞেয় বস্তু হইতে তিলমাত্রও ভিন্ন হয়, তবে যে-অংশে তাহা জ্ঞেয় বস্তু হইতে ভিন্ন, সেই অংশে তাহা ভ্রম শব্দের বাচ্য। কথায় বলে "যেখানে বাঘের ভয়, সেইখানেই সন্ধ্যা হয়"—যে বিপদের আশঙ্কা করিতেছিলাম, সেই বিপদ্ এক্ষণে সম্মুখে দণ্ডায়মান। উপরের যুক্তি অনুসারে অগত্যা দাঁড়াইতেছে এই যে, জ্ঞেয় বস্তুর সত্তা এবং সম্যক্ জ্ঞান দুয়ের মধ্যে তিলমাত্রও প্রভেদ নাই,—জ্ঞান এবং সত্তা একই। প্রভেদের পক্ষ এতক্ষণ চুপিচুপি অস্ত্র শানাইতেছিল—এক্ষণে অবসর বুঝিয়া তাহা তীব্র বেগে বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল।

সত্তাই যদি জ্ঞান হয়, তবে সত্তা তো গোড়া হইতেই আছে। সত্তাই যদি জ্ঞানের আর-এক নাম হয়, তবে তো জ্ঞান যতদূর হইবার, তাহা গোড়া হইতেই হইয়া বসিয়া আছে। তবে আর জ্ঞানকে পাইবার জন্য এত আগ্রহই বা কেন—জ্ঞানকে বাড়াইবার জন্য এত সাধ্যসাধনাই বা কেন? সত্তার তো উৎপত্তিও নাই, বিনাশও নাই, পরিবর্ত্তনও নাই, সত্তা স্বতঃসিদ্ধ; অতএব, সত্তা এবং জ্ঞান যদি একই হয়, তবে কাজেই

দাঁড়াইতেছে যে, জ্ঞানের উৎপত্তিও নাই, বিনাশও নাই, পরিবর্ত্তনও নাই; জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ। ভ্রম কিন্তু স্বতঃসিদ্ধ নহে; ভ্রমের উৎপত্তিও আছে, বিনাশও আছে, পরিবর্ত্তনও আছে। ভ্রম একটা আগন্তুক পদার্থ অর্থাৎ উড়িয়া-আসিয়া-জুড়িয়া-বসা-রকমের পদার্থ। ভ্রম যখন আগন্তুক পদার্থ, তখন তাহা না থাকিলেও না থাকিতে পারে। মনে কর, জ্ঞান হইতে সমস্ত ভ্রম ঝাঁটাইয়া ফ্যালা হইল, আর, সেই গতিকে জ্ঞান যতদূর নিখুঁত পরিষ্কার হইতে হয়, তাহা হইল। তুমি বলিতেছ যে, ওরূপ অবস্থায় সত্তার সহিত জ্ঞানের তিলমাত্রও প্রভেদ থাকে না। ইহাতে প্রকারান্তরে বলা হইতেছে এই যে, ওরূপ অবস্থায় জ্ঞানের কার্য্য ফুরাইয়া যায়, আর, সেই সঙ্গে জ্ঞান আপনিও ফুরাইয়া যায়;—থাকে কি? না, যাহা গোড়া হইতেই আছে—সত্তা-মাত্র। তবেই হইতেছে যে, জ্ঞানের পরম পরিশুদ্ধ অবস্থা জ্ঞানের অন্তিম দশা; সে অবস্থায় জ্ঞান সত্তার সাগরে ঝম্প প্রদান করিয়া প্রাণত্যাগ করে।

বাদী, প্রতিবাদী, উভয় পক্ষেরই কথা এই তো শোনা হইল। বাদী যাহাকে বলিতেছেন—জ্ঞানের পরম পরিশুদ্ধ অবস্থা, প্রতিবাদী তাহাকে বলিতেছেন—জ্ঞানের অন্তিম দশা। এই দুই কথার কাহার কি মূল্য, তাহা একবার মনের বাজারে যাচাই করিয়া দেখা যা'ক্। মন বলে এই যে, জ্ঞানের পরম পরিশুদ্ধ অবস্থা সকলেরই প্রার্থনীয়—জ্ঞানের অন্তিম দশা কাহারো প্রার্থনীয় নহে। ইহাতে এইরূপ দাঁড়াইতেছে যে, জ্ঞানের পরম পরিশুদ্ধ অবস্থার নিকটে জ্ঞানের অন্তিম দশাকে ঘেঁসিতে না দেওয়া সর্ব্বতোভাবে প্রার্থনীয়। কিন্তু এই প্রার্থনীয় কার্য্যটি ঘটাইয়া তুলিবে কে? তাহা যদি ঘটিবার না হয়, তবে তুমিও তাহা ঘটাইয়া তুলিতে পার না—আমিও তাহা ঘটাইয়া তুলিতে পারি না; আর, তাহা যদি ঘটিবার হয়, তবে তাহার একটা বন্দোবস্ত গোড়া হইতেই হইয়া আছে, তাহাতে আর ভুল নাই। জ্ঞান এবং সত্তার মধ্যে প্রভেদ রক্ষা করা যাহার কার্য্য, সে তাহা চিরকালই করিয়া আসিতেছে এবং চিরকালই করিবে—তুমি বলিলেও করিবে—না বলিলেও করিবে। সে কার্য্য কাহার কার্য্য? সে কার্য্য যাহার কার্য্য এবং যে তাহা চিরকালই অতন্দ্রিতভাবে করিয়া আসিতেছে এবং করিবেও, তাহার নাম শক্তি। শক্তিই জ্ঞান এবং সত্তার মাঝখানে দাঁড়াইয়া দুয়ের প্রভেদ চিরকাল রক্ষা করিয়া আসিতেছে এবং করিবেও তাহা চিরকাল। শক্তির কার্য্যই হ'চ্চে তাই। এই শক্তির অভ্যাগমনে আমরা ফাঁকা সত্তার বদলে গোটা সত্তা পাইতেছি। গোটা সত্তা হ'চ্চে সত্তা, শক্তি এবং জ্ঞান, তিনই একাধারে। একটি বীণাযন্ত্রের তিনটি তার। বীণাযন্ত্র হ'চ্চে আত্মা; আর, তাহার তিনটী তার হচ্চে—সত্তা, শক্তি এবং জ্ঞান। এই তিনটি তার পরস্পরের সহিত এরূপ অভেদ-প্রাণ যে, একটিতে অঙ্গুলি-কোণ ঠেকাইবামাত্রই তিনটি একসঙ্গে বাজিয়া উঠে। তা শুধু নয়—সামান্য বীণাযন্ত্রের তন্ত্রীস্থান হাতের তেলোর মতো চ্যাপ্‌টা—এইজন্য কোন্ তারটি মাঝের তার, এবং কোন্ দুটি তার পার্শ্বের তার, তাহা দেখিবামাত্রই বুঝিতে পারা যায়। পক্ষান্তরে, আলোচ্য বীণাটির তন্ত্রীস্থান বংশখণ্ডের ন্যায় চোঙাকৃতি। এইজন্য, এ বীণার তিনটি তারের প্রত্যেকটিই মাঝের তার বলিয়া গৃহীত হইতে পারে; আর যেটিকে যখন মাঝের তার বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তখন অপর দুইটি তার

সেইটিরই দুই পার্শ্বের দুইটি তার হইয়া দাঁড়ায়। ফলেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, কাজের লোকেরা শক্তিকেই মাঝের তার বলিয়া গ্রহণ করেন—পণ্ডিত লোকেরা জ্ঞানকেই মাঝের তার বলিয়া গ্রহণ করেন—ভাবের লোকেরা সত্তাকেই মাঝের তার বলিয়া গ্রহণ করেন। শাক্তের নিকটে শক্তিই জ্ঞান; বেকনের নিকটে জ্ঞানই শক্তি; ভক্তের নিকটে সত্তা বা বস্তুই সার—যেমন "বিশ্বাসে মিলয়ে বস্তু তর্কে বহুদূর!" যখন শক্তিকে সত্তা এবং জ্ঞানের মধ্যবর্ত্তী বলিয়া ধরা যায়, তখন মনে হয় যে, জ্ঞান অপেক্ষা শক্তি সত্তার নিকটের বস্তু; তেমনি আবার, যখন জ্ঞানকে শক্তি এবং সত্তার মধ্যবর্ত্তী বলিয়া ধরা যায়, তখন মনে হয় যে, শক্তি অপেক্ষা জ্ঞান সত্তার নিকটের বস্তু। প্রকৃত কথা এই যে, শক্তি এবং জ্ঞান, দুইই সত্তার সহিত ওতপ্রোত;—কাজেই দুইকে যদি সত্তা হইতে ভিন্ন করিয়া দেখিতে হয়, তবে উভয়কে সত্তা হইতে সমদূরবর্ত্তী বলাই যুক্তিসঙ্গত; আর, যদি দুইকে সত্তার সহিত অভিন্নভাবে দেখিতে হয়, তবে তো কথাই নাই;—তবে সত্তাও যা, শক্তিও তা, জ্ঞানও তা, তিনই এক হইয়া দাঁড়ায়। ন্যায়-দর্শনের একটি গোড়ার কথাই হ'চ্চে—"শক্তিশক্তিমতোরভেদঃ" শক্তি এবং শক্তি-মান্ দুয়ের মধ্যে প্রভেদ নাই। কথাগুলা বড় দার্শনিক হইয়া পড়িতেছে; অতএব একটা স্থূল উদাহরণ দিতেছি, তাহা হইলেই এখানকার প্রকৃত মন্তব্য কথাটি পাঠকের সুস্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হইবে।

আমার মনোমধ্যে আমি একটা গল্প সাজাইয়া তাহার রচনায় প্রবৃত্ত হইলাম! গল্পটি সংক্ষেপে এই ঃ—

অবন্তীরাজ্যের প্রধান মন্ত্রী নানাপ্রকার ছলে-বলে-কৌশলে রাজসিংহাসন অধিকার করিলেন এবং অবশেষে আপনার পাকচক্রে আপনি জড়াইয়া-পড়িয়া অশেষ দুর্গতি প্রাপ্ত হইলেন।

গল্পের মাঝখানটিতে দুষ্ট মন্ত্রী যখন সুখ-সমৃদ্ধিতে স্ফীত হইয়া ধরাকে সরা-জ্ঞান করিতেছে, তখনকার সে কথাটি আমার প্রকৃত মনের কথা নহে; অথচ সেই কথাটির নানাপ্রকার ডালপালা সাজাইয়া তাহাই আমাকে সর্ব্বাগ্রে রচনা করিতে হইতেছে। আমার যাহা প্রকৃত মনের কথা, তাহা সক-লের শেষে বাহির হইবে। দুষ্ট মন্ত্রীর দুর্গতি-আকাঙ্ক্ষা রচিতব্য উপন্যাসটির বীজ। সেই বীজটি এক্ষণে আমার মনের মধ্যে মাটি-চাপা রহিয়াছে। গল্পের শেষভাগে ঐ বীজটি যখন প্রকাশ্যে বহির্গত হইবে, তখন তাহা শস্যের আকার ধারণ করিবে; অথবা, যাহা একই কথা—নিজমূর্ত্তি ধারণ করিবে। এখন, যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, বীজের সর্ব্বাপেক্ষা নিকটের বস্তু কে? তবে তাহার দুই ভাবের উত্তর দুইপ্রকার। এক ভাবের উত্তর এই যে, বীজের সর্ব্বা-পেক্ষা নিকটের বস্তু হ'চ্চে অঙ্কুর; আর-এক ভাবের উত্তর এই যে, বীজের সর্ব্বা-পেক্ষা নিকটের বস্তু হ'চ্চে শস্য। প্রথম ভাবের উত্তরটির ভাবার্থ যে কি, তাহা তাহার গায়ে লেখা রহিয়াছে; তাহা এই যে, বীজের অব্যবহিত-পরবর্ত্তী দেশকালে অঙ্কুর ফুটিয়া বাহির হয়। দ্বিতীয় ভাবের উত্তরটির একটু টীকা করা আবশ্যক। সে টীকা এই ঃ—

শস্যই বীজের নিজমূর্ত্তি। অঙ্কুর বীজের ব্যতিমূর্ত্তি। উপন্যাসের শেষের কথাটিই আমার মনের নিকটতম বস্তু;—মাঝের ডালপালা সেই নিকটতম বস্তুটিকে দূরে সরাইয়া রাখিতেছে। মাঝের ডালপালা

আমার মনের এত যে বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে—তথাপি তাহাকে আমি একটীবারও নিবারণ না করিয়া ক্রমিকই প্রশ্রয় দিতেছি। কেন এরূপ করিতেছি? তাহার কারণ কি? কারণ আর কিছু না—বিপরীত ভাবের প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়া মনোগত ভাবটীকে বিধিমতে ফুটাইয়া তুলিবার ইচ্ছা। এখানে দ্রষ্টব্য এই যে, গল্পের ডালপালা সাজাইয়া যে কথাটীকে আমি সেই জঙ্গলাকীর্ণ প্রাচীরের ও-পিটে সরাইয়া রাখিতেছি, সেই শেষের কথাটী গোড়াতেই আমার মনে উপস্থিত হইয়াছিল এবং গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত ক্রমাগতই তাহা আমার মনে নিরবচ্ছেদে লাগিয়া রহিয়াছে। তবেই হইতেছে যে, সেই শেষের কথাটীই সর্ব্বাপেক্ষা আমার মনের নিকটের বস্তু। এখন কথা হ'চ্চে এই যে, বীজ যেমন ডালপালার মধ্য দিয়া শস্যাকারে ফুটিয়া বাহির হইয়া নিজমূর্ত্তি ধারণ করে, সত্তা সেইরূপ শক্তিস্ফূর্ত্তির মধ্য দিয়া জ্ঞানাকারে ব্যক্ত হইয়া নিজমূর্ত্তি ধারণ করে। যে হিসাবে শস্য বীজের নিকটতম বস্তু (অর্থাৎ যে হিসাবে গল্পের শেষের কথাটীই গোড়ার কথা) সেই হিসাবে, জ্ঞান, সত্তার নিকটতম বস্তু; আর যে হিসাবে অঙ্কুর বীজের নিকটতম বস্তু, সেই হিসাবে, শক্তি সত্তার নিকটতম বস্তু। যদি শক্তির প্রতি আদবেই দৃক্‌পাত না করা যায়, তবে জ্ঞান এবং সত্তা একাকারে পরিণত হয়, তাহা আমরা একটু পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। এটাও তেমনি দেখা উচিত যে, যদি জ্ঞানের প্রতি আদবেই দৃক্‌পাত করা না যায়, তবে সত্তা এবং শক্তি একাকারে পরিণত হয়; কেন না, জ্ঞানের ভোগে না আসিলে শক্তির সমস্ত কার্য্যই ব্যর্থ হইয়া গিয়া একান্তপক্ষেই তাহা ভূতের ব্যাগার হইয়া দাঁড়ায়। মনে কর—আর সবই হইয়াছে, কেবল চেতন-পদার্থ হয়ও নাই, আর, ভবিষ্যতে যে হইবে, তাহার সম্ভাবনাও নাই; এরূপ অবস্থায় শক্তি কেন-যে শুধু-শুধু খাটিয়া মরিবে, তাহার কোনো অর্থ থাকে না; কাজেই, ওরূপ উদ্দেশ্য-বিহীন, লক্ষ্য-বিহীন, অর্থ-বিহীন অবস্থায় শক্তি সত্তাতে বিলীন হইয়া গেলেই বাঁচে; তা শুধু নয়—ওরূপ অবস্থায় শক্তি আগেভাগেই সত্তাতে বিলীন হইয়া বসিয়া আছে; কেন না, জ্ঞানের নিকটে শক্তির কার্য্য প্রকাশ পাওয়াতেই শক্তির শক্তিত্ব হয়—শক্তির প্রকাশ বন্ধ হওয়ার নামই শক্তির প্রলয়-অবস্থা। জ্ঞান না থাকিলে শক্তির প্রকাশ বন্ধ হইয়া যায়; শক্তির প্রকাশ বন্ধ হইয়া গেলেই শক্তি সত্তাতে বিলীন হইয়া যায়। এইরূপ আমরা দেখিতেছি যে, একদিকে, শক্তি,—জ্ঞান এবং সত্তার মাঝখানে দাঁড়াইয়া জ্ঞান এবং সত্তার প্রভেদ রক্ষা করিতেছে; আর এক দিকে, জ্ঞান,—সত্তা এবং শক্তির মাঝখানে দাঁড়াইয়া সত্তা এবং শক্তির প্রভেদ রক্ষা করিতেছে।

এতক্ষণের ধস্তাধস্তির পরে প্রকৃত কথাটির দর্শন পাওয়া গেল; তাহা কি? না সত্তা, শক্তি এবং জ্ঞানের প্রভেদাত্মক অভেদ এবং অভেদাত্মক প্রভেদ, এক কথায়—একাত্মভাব।

গোড়াতেই আমাদের মনে বিষম এক আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছিল এই যে, জ্ঞানের পরম পরিশুদ্ধ অবস্থা যদি জ্ঞানের অন্তিমদশারই আর-এক নাম হয়, তবেই তো বিপদ্! এক্ষণে দেখিতেছি যে, সে আশঙ্কা নিতান্তই অমূলক। কেন না, সত্তা বলিলেও সত্তা শক্তি এবং জ্ঞান একসঙ্গে বুঝায়—জ্ঞান বলিলেও সত্তা শক্তি এবং জ্ঞান একসঙ্গে বুঝায়; শক্তি বলিলেও সত্তা শক্তি এবং জ্ঞান এক সঙ্গে বুঝায়;

প্রভেদ কেবল এই যে, সত্তা বলিলে সত্তা-প্রধান জ্ঞান-এবং-শক্তি বুঝায়, শক্তি বলিলে শক্তি-প্রধান সত্তাএবং জ্ঞান বুঝায়, জ্ঞান বলিলে জ্ঞান-প্রধান শক্তি-এবং-সত্তা বুঝায়। সত্তাকে যদি সত্তা প্রধান জ্ঞান-এবং শক্তি না বলিয়া তাহাকে জ্ঞান এবং শক্তি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌রূপে গ্রহণ করিতে চাও; শক্তিকে যদি শক্তি-প্রধান জ্ঞান-এবং-সত্তা না বলিয়া জ্ঞান-এবং সত্তা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌রূপে গ্রহণ করিতে চাও; জ্ঞানকে যদি জ্ঞান প্রধান শক্তি-এবং-সত্তা না বলিয়া তাহাকে সম্পূর্ণ পৃথক্‌রূপে গ্রহণ করিতে চাও; তবে তাহা করিয়া দেখ—তাহা হইলেই তোমার চক্ষু ফুটিবে। সত্তাকে তুমি যদি শক্তি হইতে পৃথক্ কর, তবে সত্তার সহিত তোমার কোনো সম্বন্ধই ঘটিতে পারিবে না; সত্তাকে যদি জ্ঞান হইতে পৃথক্ কর, তবে সত্তা তোমার নিকটে প্রকাশই পাইতে পারিবে না। এরূপ অবস্থায়, তোমার মুখে সত্তা-শব্দ একটা নিতান্তই উড়া সামগ্রী, তাহা বায়ুর অধিক আর কিছুই নহে। তেমনি, জ্ঞানকে সত্তা-এবং-শক্তি হইতে পৃথক্ করিলে জ্ঞানও কিছুই-না হইয়া যাইবে; শক্তিকে সত্তা-এবং-জ্ঞান হইতে পৃথক্ করিলে তাহারও ঐ দশা ঘটিবে। ফল কথা এই যে, দীপ যেমন দীপশিখা, দীপরশ্মি এবং দীপালোক তিনই একাধারে, আত্মা তেমনি আত্মসত্তা, আত্মশক্তি এবং আত্মজ্ঞান, তিনই একাধারে। অতএব এটা স্থির যে, সাধকের জ্ঞানে যদি আত্মা প্রকাশিত হ'ন, তবে আত্মার সত্তা, শক্তি এবং জ্ঞান, তিনই একসঙ্গে প্রকাশিত হইবে; এরূপ হইবে না যে,

(১) জ্ঞান এবং শক্তি অন্তর্হিত হইয়া শুদ্ধকেবল সত্তামাত্র প্রকাশ পাইতেছে;

অথবা

(২) শক্তি এবং সত্তা অন্তর্হিত হইয়া শুদ্ধকেবল জ্ঞানমাত্র প্রকাশ পাইতেছে;

অথবা

(৩) সত্তা এবং জ্ঞান অন্তর্হিত হইয়া গিয়া শুদ্ধকেবল শক্তিমাত্র প্রকাশ পাইতেছে।

মাঝপথের ব্যাপার অনেকটা বলিয়া চুকিলাম। অল্প-একটু যাহা বাকি আছে, তাহা বারান্তরের জন্য স্থগিত রাখা হইল। বিষয়টি এইঃ—আত্মজ্ঞানের ভিতরে ঐ তিন পদার্থের (সত্তা, শক্তি এবং জ্ঞানের) তারতম্যই বা কিরূপ—সামঞ্জস্যই বা কিরূপ—তাহার পর্য্যালোচনা।

বিশ্বকার্য্যে বিশ্ববিধাতা।

আজ কত বৎসর হইল আমাদের দেশে এক মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যখন পাশ্চাত্য ভাবের প্রবাহ আসিয়া আমাদের সেই ঋষিদিগের শত শত বৎসরের সাধনের ফল ভাসাইয়া লইয়া যাইবার উপক্রম করিয়াছিল, যখন মোহমুগ্ধ ভারতবাসীরা তাহাদের চিরন্তন মর্য্যাদা বিস্মৃত হইয়া চিরাভ্যস্ত মাতৃক্রোড় হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার উপক্রম করিয়াছিল, তখন মহাত্মা রামমোহন রায় জন্মগ্রহণ করিলেন। তিনি আসিয়া আবার সেই পূজনীয় ঋষিদিগের স্তব্ধ গীত ধ্বনিত করিয়া তুলিলেন এবং সকল আবর্জ্জনা দূর করিয়া যাহা সত্য তাহাই আবার ভারতবাসীদিগকে চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিলেন। তাঁহার পর পূজ্যপাদ প্রপিতামহদেব সেই স্রোত বজায় রাখিবার জন্য—ভারতের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সকল স্বার্থ বলিদান দিলেন। সে স্রোত আজ কোথায়? সেই ভাগীরথী হিমালয়ের বক্ষ হইতে প্রবাহিত

হইয়া সাগরগর্ভে বিলীন হইতেছে; সেই হিমালয় তুষার-কিরীট মস্তকে ধারণ করিয়া এখনও বিরাজমান; কিন্তু সেই পুণ্যে বীর্য্যে জ্ঞানে প্রীতিতে ভূষিত ভারতবাসীদিগের সুন্দর প্রফুল্ল মুখ এখন কেন এত মলিন হইয়া গিয়াছে? তাহার কারণ আন্তরিক ধর্ম্মভাবের অভাব। আজ আমরা এই পবিত্র ব্রহ্মমন্দিরে সমবেত হইয়াছি কিসের জন্য? একেশ্বরের উপাসনার জন্য তাহাতে সন্দেহ নাই! কিন্তু আজ যেমন আমরা প্রীতিকুসুমে অঞ্জলি ভরিয়া তাঁহার পূজা করিতেছি, আজ যেমন আমরা সমস্ত সুখ দুঃখ ভুলিয়া তাঁহার মহিমাকীর্ত্তনে, তাঁহার গুণগানে, তাঁহার ধ্যানে চিত্ত সমর্পণ করিয়াছি, ইহা ক্ষণিকের জন্য নহে। এই ভাব সকল সময়ে সকল অবস্থাতে মনে জাগ্রত রাখিবার জন্য আমাদের সচেষ্ট হওয়া উচিত।

তাঁহাকে ধরিতে কি পারা যায় না? তাঁহার করুণা কি অনুভব করা যায় না? নিশ্চয়ই যায়! ইহা মুক্তকণ্ঠে ঋষিরা বলিয়া গিয়াছেন। যখন আমরা একটি সুন্দর ফুলের প্রতি নিরীক্ষণ করি, তাহার মধ্যে কি তাঁর সৌন্দর্য্যের বিকাশ স্পষ্টরূপে দেখিতে পাই না? যখন তরুণ ভানু পূর্ব্বগগনে উদিত হইয়া বিশ্বজগৎকে সুপ্তি হইতে জাগ্রত করিয়া আপন আপন কার্য্যে তাহাদিগকে নিযুক্ত করে, তাহার মধ্যে কি তাঁহার অনন্ত শক্তির স্ফূর্ত্তি অনুভব করিতে পারি না? যখন আমাদের প্রয়োজনীয় বস্তু সকল চাহিবার পূর্ব্বেই আমাদের জন্য সমস্তই প্রস্তুত দেখিতে পাই তখন কি আমরা তাঁহার অপার করুণা অনুভব করিতে পারি না? এইটী অনুভব করিতে পারিলে আর আমাদের কোনও দুঃখ থাকে না, তখনই আমরা বুঝিতে পারি যে এই সুখ এই আনন্দের বিধাতা একজন আছেন যিনি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত, পরিপূর্ণ, অখণ্ড, অনন্ত ও সত্য।

আমরা কি অবলম্বন করিয়া এই সংসারে সুখে বিচরণ করিতে পারি! কিসের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিলে সকল বাধা বিঘ্ন ঠেলিয়া আমরা ইহকালে এবং পরকালে অখণ্ড আনন্দ ও শান্তি উপভোগ করিতে পারি? তাহা ধর্ম্ম। ধর্ম্মই আমাদের একমাত্র সহায় ও সুহৃৎ।

"ধর্ম্ম এব হতো হন্তি ধর্ম্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ
তস্মাৎ ধর্ম্মো ন হন্তব্যো মা নোধর্ম্মো হতোঽবধীৎ।"

এই যে জগৎ একই নিয়মে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে; গ্রহ চন্দ্র তারা আপন আপন নিয়মে ঘুরিতেছে এবং নিয়ত ভ্রাম্যমাণ কালের চক্র জন্ম মৃত্যুরূপ অবস্থার পরিবর্ত্তন সংঘটন করিতেছে, ইহার মধ্যে এক শক্তি বিরাজমান রহিয়াছে। যদি ইহাদের পরিচালক এক শক্তি না থাকিত, তাহা হইলে কখনই ইহারা একই নিয়মে এই অনন্ত কাল ধরিয়া কার্য্য করিয়া আসিতে পারিত না। এই সকল কার্য্যের যিনি পরিচালক তিনিই আমাদের আরাধ্য দেবতা এবং তাঁহার সহিত যে নিত্য বন্ধনে আমরা বদ্ধ আছি সে বন্ধন দুশ্ছেদ্য। আমরা নানারূপ কল্পনার বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে নানা ভাবে ধারণ করিবার চেষ্টা করিতে পারি কিন্তু তিনি যাহা আছেন তাহাই আছেন এবং চিরকাল সেইরূপই থাকিবেন, তিনি আমাদের চিরবন্ধু, চিরনির্ভর, চিরশান্তি।

আমাদের নির্লিপ্ত ভাবে সংসার ধর্ম্মপালন করিতে হইবে এবং সকল সময়ে সকল অবস্থাতে তাঁহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া থাকিতে হইবে ইহাই ব্রাহ্মধর্ম্মের শিক্ষা। ইহাই আমাদের সনাতন ধর্ম্ম, এবং

ইহা হইতে বিচ্যুত হইয়াই আমরা নানা দুঃখ কষ্ট ভোগ করিতেছি এবং শক্তিহীন ধর্ম্মহীন হইয়া অপরের পদদলিত এবং লাঞ্ছিত হইতেছি। হে দীনদয়াল, তুমি আমাদের নিকটে রহিয়াছ, তবু আমরা মনে করি যেন তুমি দূরে। আমাদের এই মোহ-আবরণ উন্মোচন কর এবং তোমার পথে আমাদিগকে লইয়া যাও। তোমাকে ভুলিয়া আমরা কয়দিন থাকিতে পারি? তুমি যে আপনার হইতেও আপনার, আমাদের পরম সুহৃদ ও মঙ্গলদাতা। হে পরমাত্মন্! আমাদের এই শুষ্ক জীবনে তোমার প্রসাদবারি বর্ষিত হউক, যাহার দ্বারা আমরা নূতন উৎসাহে নূতন হর্ষে, তোমার আজ্ঞা পালন করিতে পারি এবং সুখে, দুঃখে, সম্পদে, বিপদে তোমার মঙ্গল ইচ্ছার মধ্যে আত্ম-সমর্পণ করিতে পারি এই আশীর্ব্বাদ আমাদিগকে কর। এই মৃত্যুরূপ আঁধার পূর্ণ জগতে তুমিই একমাত্র আশ্রয় ও ভরসা এবং এই মরুভূমিতে তুমিই একমাত্র উৎস।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

রাজনীতি-সংগ্রহ।

রাজা স্বভৃত্যোপনীত যানে আরোহণ করিবেন। তিনি অপরিচিত কি সঙ্কট পথে কখনই যাইবেন না। তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তী লোকসকল বংশক্রমাগত ও বিশ্বস্ত হইবে এবং তিনি তাহাদের প্রত্যেকেরই কার্য্য বিভাগ করিয়া দিবেন। আর যাহারা অধার্ম্মিক ক্রূর দৃষ্টদোষ ও বহিষ্কৃত এবং যাহারা অন্য কর্ত্তৃক আনীত, দূর হইতে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন। যে নৌকা প্রচণ্ড বায়ু দ্বারা বিঘূর্ণিত, যাহার নাবিক পরীক্ষিত নয়, যাহা অন্য নৌকায় আবদ্ধ বা জীর্ণ রাজা কদাচ তাহাতে আরোহণ করিবেন না। উত্তাপের দিনে তীরে সৈন্য রাখিয়া যে জলাশয়ে নক্রাদি জলজন্তু নাই তিনি সুহৃদ্গণে পরিবৃত হইয়া তাহাতে অবগাহন করিবেন। পুরের বহির্ভাগে যে সমস্ত উদ্যান ও বন আছে তৎসমূহের নিবিড়তর প্রদেশ পরিহার করিয়া পরিস্কৃত স্থানে যাইবেন এবং তন্মধ্যে সমবয়স্ক সুহৃদ্গণের সহিত সাবধানে নানা সুখ উপভোগ করিবেন কিন্তু সুখাসক্তি হেতু স্বকার্য্য বিস্মৃত হইবেন না। মৃগয়াটন রাজার ধর্ম্ম, তিনি বিনীত ও বেগবান অশ্বে আরোহণ করিয়া লক্ষ্যসিদ্ধির নিমিত্ত যে বন সুগম এবং যাহার অন্তঃসীমা পরীক্ষিত ও রক্ষিত তাহাতে গমন করিবেন। মাতার নিকট যাইতে হইলেও অগ্রে গৃহশুদ্ধি তাঁহার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য, পরে শস্ত্রধারী হইয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিবেন কিন্তু নিবিড় ও সঙ্কট স্থানে অবস্থান করা তাঁহার উচিত নহে। যখন বায়ু উত্থিত হইয়া ধূলিজালে দিগন্ত আচ্ছন্ন করিবে, যখন অনবরত বৃষ্টিপাত হইতে থাকিবে, অথবা যখন অতি রৌদ্র বা অতি অন্ধকার তখন সুস্থ থাকিলেও বহির্গত হইবেন না। তিনি রাজপথে অতি আড়ম্বরের সহিত গমনাগমন করিবেন এবং অধিকৃত ভৃত্যেরা তাঁহার অগ্রে অগ্রে উৎসারণা (লোক তফাৎ) করিতে থাকিবে। তিনি যাত্রা উৎসব ও সমাজে জনসম্বাধময় প্রদেশে প্রবেশ করিবেন না এবং তথায় অধিক কাল থাকিবেন না। তাঁহার অন্তঃপুর-সঞ্চারকালে কঞ্চুকধারী ও উষ্ণীষশোভিত বর্ষধর, কুব্জ, কিরাত ও বামনেরা সতত পার্শ্ববর্ত্তী থাকিবে এবং শুদ্ধস্বভাব চিত্তজ্ঞ অন্তঃপুরস্থ অমাত্যেরা শস্ত্র অগ্নি ও বিষ-সম্পর্কে সাবধান হইয়া তাঁহার সহিত ক্রীড়া করিবেন। অশীতি বর্ষের পুরুষ ও

পঞ্চাশৎবর্ষবয়স্কা স্ত্রীরা সতত তাঁহার অন্তঃপুরের বিশুদ্ধতা রক্ষা করিবে। যে সমস্ত লোক অন্তঃপুরচারী তাহারা কোন জটিল ও মুণ্ডী এবং বহিঃস্থ দাসীদিগের সহিত কদাচ কোনও সম্পর্ক রাখিবে না। আর ইহারা আবশ্যক হইলে তথা হইতে নির্গমন ও প্রবেশ করিতে পাইবে। অনুজীবি অসুস্থ হইলে রাজা তাহাকে নিকটবর্ত্তী হইতে দিবেন না, কিন্তু যদি কেহ প্রাণান্তিক রোগে আক্রান্ত হয় তাহার সম্যক্ তত্ত্বাবধান করিবেন, কারণ আতুর কাহারই উপেক্ষণীয় নহে। তিনি স্নাত ও অনুলিপ্ত হইয়া মাল্য ও অলঙ্কার ধারণ পূর্ব্বক দেবীগৃহে যাইবেন কিন্তু তাঁহার নির্দ্দিষ্ট গৃহ ছাড়িয়া ঐ গৃহে কখন গমন করিবেন না। যদি রাজমহিষী অতিমাত্রও প্রিয় হন তথাচ তাঁহাতে সম্যক্ বিশ্বাস স্থাপন করা তাঁহার উচিত নয়। পূর্ব্বে সহোদর ভ্রাতা দেবীগৃহগত ভদ্রসেনকে বধ করিয়াছিল এবং ঔরস পুত্র জননীর অন্তরালে থাকিয়া রাজা কারুষকে মারিয়াছিল। রাজমহিষী খাদ্য দ্রব্যের সহিত বিষ সংযোগ করিয়া নির্জনগত কাশীরাজকে হত্যা করেন। বিষদিগ্ধ মেখলামণি দ্বারা সৌবীর, নূপুর দ্বারা বৈরন্ত্য, দর্পণ দ্বারা জারূষ এবং বেণীর অন্তর্নিহিত শস্ত্র দ্বারা বিদূরথ নিহত হন। ফলত বিশ্বস্ত পুরুষ দ্বারা যে রাজার মহিষী সকল সুরক্ষিত তাঁহার ইহলোক ও পরলোক উভয়ত্রই ভোগ অক্ষুণ্ণ থাকে। ধর্ম্মশীল নৃপতি প্রতি রজনীতে অনুক্রমে সকল মহিষীর গৃহেই গমন করিবেন, কিন্তু তৎকালেও তাঁহার হস্তে শস্ত্র থাকিবে এবং বিশ্বস্ত লোক তাঁহার শরীর রক্ষা করিবে। রাজা নীতিচক্ষু উন্মীলন করিয়া নিরন্তর জাগরণ করিলে প্রজারা নির্ব্বিঘ্নে নিদ্রা যায়, আর তিনি অসাবধান হইয়া সভয়ে নিদ্রিত হইলে তাহাদেরও জাগরণে রাত্রি কাটিয়া যায়। পূর্ব্বতন মুনিগণ রাজার সম্বন্ধে এইরূপই নীতি নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। যিনি ইহা যত্নত পালন করেন তিনিই নৃপতি নামের যোগ্য হইতে পারেন।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭৪, আশ্বিন মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	৫১৫॥৶৬
পূর্ব্বকার স্থিত	...	৬৩০৸৵৩
সমষ্টি	...	১১৪৬॥/৯
ব্যয়	...	৫৯৪।৶৩
স্থিত	...	৫৫২ ৵৬

জায়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত
আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন
এককেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ
৫০০৲

সমাজের ক্যাশে মজুত ৫২ ৵৬

৫৫২ ৵৬

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ ... ৩৯৩॥/৹

মাসিক দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৮০৲

সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু যজ্ঞেশপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়
১০৲

শুভকর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর
২০০৲

দানাধারে প্রাপ্ত ৩॥/০

৩৯৩॥/০

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৬।৵৹
পুস্তকালয়	...	১০। ৬
যন্ত্রালয়	...	১০৪৲
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন		১॥০
সমষ্টি		৫১৫॥৶৬

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	৩২৭৸৶৯
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৪১॥৵৬
যন্ত্রালয়	...	২২৪৸/০
সমষ্টি		৫৯৪।৶৩

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ শিরোমণি। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
ধনরক্ষক। সম্পাদক।

Sermons of Maharshi Debendranath Tagore.

(Translated from Bengalee.)

SERMON XXXVIII.

Divine Contemplation In The Holy Hour of The Early Morning.

Dedicate your mind to God at this charming, peaceful hour of the early morning. At this time the condition of our body, mind and understanding is most favorable for such dedication. At all other times our mind is diverted to a variety of matters, becomes absorbed in diverse objects, but not so at this supremely refreshing hour of the early morning which displays so brightly the immaculate picture of God. The calmness and the flawless order with which the whole universe performs the work appointed to it by the Ordainer of all that is, reign also over our interior self. Every aspect of this time, being favorable to divine meditation, calls us unto God. Negiect not a time so holy and not always at our command; sanctify yourselves by once plunging into that all pervading Ocean of Nectar; fix your mind on Him who is all holy, impervious to sin, and the sanctifier of all that sanctifies, and taste the sweetness of His sanctity. If you be oblivious of God in this sacred place and at this holy time of the day and under the favorable aspects that reign here, then when will you remember Him? If you can not grasp now His immaculate purity, His matchless beauty which is manifested through the beauty of the morning that shineth at this moment, then when will you grasp them? When the fire of the world will burn your veins, when you will be cast into the billowy sea of worldly work, when nothing but the din of the world will be audible to you, will you then be able to embrace the Lord so easily as you can now? The boundless joy which our soul feels now from its union with that omnipresent Being we shall be denied when we shall be in the midst of worldly life; let us now cool ourselves by bathing in that Ocean of Nectar, so that we may be fit to endure the fierce heat of the world. In this cheerful hour of the morning as we associate with God our soul is sanctified and ennobled, but this holy influence will wear off in the midst of the turmoil induced by worldly infatuation. What is the remedy for this? The remedy lies in never neglecting the happy moment when the thought of God is kindled in our soul. Drink at times the nectar of His holiness so copiously that it may keep you cool for a long time to come. Dig a tank in your soul so that whenever the waters of divine mercy fall on you, they may not be lost but be held in it. Pray always to God that He may shower the waters of His mercy more and more abundantly on you. Remain constantly as attached to Him as we feel to be now at this holy, peaceful hour when we are sheltered in His lap. Encompassed by the golden light of the sun we are worshipping the Lord in this hour of the early morning; behold Him as brightly manifested as this light of the sun and keep yourselves devoted to His work. Many and diverse are the thoughts that are rising in our minds at this moment, yet we do not

forget that the day shines. Thus may the light of God pervade all works that we do. To those who are occupied with only self, this universe is a place of amusement, a mere play-house. But to those who are animated by the love of God, this universe is a holy, divine temple. They perceive in the existence of this universe the existence of a higher and nobler Entity; they behold reflected in it His wisdom and His beneficent light. May we never neglect to utilize this holy hour, may it be our constant aim to make all times favorable for obtaining God. At every rising and setting of the sun, at the passing of every fortnight and every month, may we reflect on our actual spiritual condition, may we remember that we are approaching our goal. May we never forget the mercy which God showers upon us unremitttingly at every moment, and day after day and month after month! Oh, how great is His mercy! How happily did we sleep on His lap last night! How greatly did that reveal God's parental love towards us! Lest our sleep be disturbed, the singing birds became silent and the bright, effulgent sun passed below the horizon. Oh, how can I speak adequately of the love in which we are nursed in an undeterminable way month after month and year after year, when we can not define the limits of His mercy that He vouchsafes unto us during one single moment. What good is there that God forbears from doing to us? What hope is there that we may not expect to be fulfilled through His goodness?

The God of the Upanishads.

By RABINDRA NATH TAGORE.

(Translated from Bengalee)

(Concluded.)

During day and night, in sleep and in the waking state, within and without, we move in God, being enveloped and steeped in Him. No monarch, however powerful, no foe, however inveterate, shall deprive us of or separate us from Him through any fierce general disturbance. Can not we all Indians, overawed and disgraced as we are, unite to-day and with the palms of our hands joined together and our faces uplifted, cry out.——

"অজাত ইত্যেবং কশ্চিদ্ভীরুঃ প্রতিপদ্যতে।
রুদ্রযত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যং।"

"Thou art unproduced and without birth; here is a timid soul that seeks Thy protection; O Thou of stern aspect, protect me always by Thy countenance of benign expression."

God is—so fear not, fear not. If ignorance faces you, remove it from your path; if injustice confronts you, attack it with all your energy; if superstition impedes your progress, break it with all your might; keep your gaze fixed only on God and do His work ceaselessly. If for this you are blamed, then let that blame adorn your forehead as a *tilak* or a mark of your devotion to your God; if adversity be the consequence, then raise it up to your head and let it decorate it as a crown of glory; and if death comes to you then accept it as immortality. Animated by hopes that are not exha-

usted, cheered on by a strength that fails not, confident of an endless life and invested with the supreme glory of the service of God, advance on the world's perilous path with your body erect and with your heart full of sincerity. In happiness, say "অস্তি" "He is;" in misery, affirm "অস্তি" "He is;" in peril, cry out "অস্তি" "He is." Obtaining for your soul in the Supreme Soul unhampered liberty, boundless joy, unconquerred fearlessness, wash away completely all dishonor, all poverty, and all langour of body or mind. And then proclaim, "I have derived joy from that great, uncreate Spirit from whom mind and word recoil after repeated efforts to grasp Him; I never fear and by none am I frightened; decay or death or sorrow can not touch me.' Say ;—

"ওঁ আপ্যায়ন্তু মমাঙ্গানি বাক্‌প্রাণশ্চক্ষুশ্রোত্রমথো,
বলমিন্দ্রিয়াণি চ সর্ব্বাণি সর্ব্বং ব্রহ্মৌপনিষদং।
মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং মামা ব্রহ্মনিরাকরোৎ,
অনিরাকরণমস্তু অনিরাকরণং মেহস্তু।
তদাত্মনি নিরতে য উপনিষৎসু ধর্ম্মাঃ,
তে ময়ি সন্তু তে ময়ি সন্তু॥"

"May the God of whom the Upanishads sing and who is the searcher of hearts and knower of all that is hidden gratify my voice, the vital principle in me, my eyes, my ears, my strength, my senses and all my limbs. God has not forsaken me, may I not forsake Him. Let Him be unforsaken; let Him be unforsaken by me. Let the virtues extolled in the Upanishads blossom in me who is devoted to the Supreme Spirit. Amen!

OM. Peace! Peace! Peace!

God the saviour of sins.

OM.

ERRATA.

Page	Col	Line	For	Read
25	2	27	Echoe	Echo
26	1	12	Respector	Respecter
26	1	17	Fances	Fancies
26	2	10	Than	Then
26	2	13	They who know Him become immortal.	"They who know Him become immortal."
27	1	43	existen ceof	existence of
27	2	4	Your	Thy
27	2	22	dot	not

A RARE CHANCE.

The Manufacturers of Dentol (an excellent Tooth Powder) or Removeline (the painless Hair-removing Oil), with a view of introducing their speciality in India and abroad, will give Rs. 50,500 in Cash to the *first*, 7,164 purchasers.

					Rs.	Rs.
1st	prize for	1st	purchaser		10,000	10,000
2nd	,,	2nd	,,		5,000	5,000
3rd	,,	3rd	,,		2,000	2,000
4th	,,	4th	,,		1,000	1,000
10	prizes	5th	to 14th	Each	500	5.000
50	,,	15th	to 64th	,,	100	5,000
100	,,	65th	to 164th	,,	50	5,000
200	,,	165th	to 364th	,,	52	5,000
300	,,	365th	to 664th	,,	10	3 000
500	,,	665th	to 1,164th	,,	5	2,500
1,000	,,	1,165th	to 2,164th	,,	2	5,000
5,000	,,	2,165th	to 7,164th	,,	1	5,000

The above amount will be divided when 90,000 bottles will be sold. Price, each bottle, Re. 1. The result will be published in the leading newspapers, and due information will also be given to the purchasers.

RAM DHAN,
BANKER & GENL SUPPLIER, LAHORE.

ষোড়শ কল্প
প্রথম ভাগ।
পৌষ ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭৪।

৭১৫ সংখ্যা ১৮২৫ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ছান্দোগ্যোপনিষদ্।

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

আকাশো বাব তেজসো ভূয়ানাকাশে বৈ সূর্য্যাচন্দ্রমসাবুভৌ বিদ্যুন্নক্ষত্রান্যগ্নি-রাকাশেনাহ্বয়ত্যাকাশেন শৃণোত্যাকাশেন প্রতিশৃণোত্যাকাশেরমত আকাশে ন রমত আকাশে জায়ত আকাশমভিজায়ত আকাশ মুপাস্স্বেতি। ১।

'আকাশঃ বাব তেজসঃ ভূয়ান্' বায়ুসহিতস্য তেজসঃ কারণত্বাদ্ব্যোম্নো বায়ুমাগৃহ্যেতি তেজসা সহোক্তো বায়ুরিতি পৃথগিহ নোক্তস্তেজসঃ কারণং হি লোকে কার্য্যাদ্ভূয়োদৃষ্টং 'আকাশে বৈ সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ উভৌ' তেজোরূপৌ 'বিদ্যুৎ নক্ষত্রাণি অগ্নিঃ চ' তেজোরূপাণি কথং আকাশেঽন্তঃ। যচ্চ যস্যাহন্তর্বর্ত্তি তদল্পং ভূয়ইতরং। কিঞ্চ 'আকাশেন আহ্বয়তি' অন্যমন্য আহূতশ্চেতরঃ 'আকাশেন শৃণোতি' অন্যোক্তঞ্চ শব্দমন্যঃ 'আকাশেন প্রতিশৃণোতি' 'আকাশে রমতে' ক্রীড়ত্যন্যোন্যং সর্ব্ব-স্তথা 'ন রমতে' চাকাশে বন্ধ্বাদিবিয়োগে 'আকাশে জায়তে' ন মূর্ত্তেনাবষ্টব্ধে। তথা 'আকাশং অভিজায়তে' আকাশমভিলক্ষ্যাঙ্কুরাদি জায়তে অতঃ 'আকাশং উপাস্স্ব ইতি'। ১।

আকাশ তেজ হইতে শ্রেষ্ঠ। সূর্য্য, চন্দ্র, বিদ্যুৎ, নক্ষত্র আকাশের অন্তস্থ। একজন অন্যকে আকাশের গুণেই আহ্বান করে, আকাশের গুণেই শ্রবণ করে, প্রতি-শ্রবণ করে, আকাশে ক্রীড়া করে, কেহ বা ক্রীড়া না করে, আকাশে দেহান্তে লীন হয়, অঙ্কুরাদি আকাশাভিমুখে উত্থিত হয়। তুমি আকাশের উপাসনা কর। ১।

স য আকাশং ব্রহ্মেত্যুপাস্ত আকাশ-বতো বৈ স লোকান প্রকাশবতোঽসম্বাধানু রুগায়বতোঽভিসিদ্ধ্যতি যাবদাকাশস্য গতং তত্রাস্য যথা কামচারো ভবতি য আকাশং ব্রহ্মেত্যুপাস্তেঽস্তি ভগব আকাশাদ্ভূয় ইত্যা-কাশাদ্বাব ভূয়োঽস্তীতি তন্মে ভগবান্ ব্রবী-ত্বিতি। ২। ১২।

'সঃ যঃ আকাশং ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে' 'আকাশবতঃ বৈ' বিস্তারযুক্তান্ 'সঃ' বিদ্বান্ 'লোকান্ প্রকাশবতঃ' 'অসম্বাধান্' সম্বাধোঽন্যোন্যপীড়া তদ্রহিতান্ 'উরুগায়বতঃ' বিকীর্ণগতীন্বিস্তীর্ণপ্রচারান্ 'অভিসিদ্ধ্যতি'। 'যাবৎ আকাশস্য গতং তত্র অস্য যথা কামচারঃ ভবতি যঃ আকাশং ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে'। 'অস্তি ভগবঃ আকাশাৎ বাব ভূয়ঃ অস্তি ইতি' 'তৎ মে ভগবান্ ব্রবীতু ইতি'। ২। ১।

যিনি আকাশ ব্রহ্মের উপাসনা করেন তিনি বিস্তারযুক্ত প্রকাশবান অসম্বাধ বিস্তীর্ণ লোক সকল প্রাপ্ত হন। যতদূর আকাশের গোচর, কামচারী রাজার ন্যায় ততদূর

তাঁহার গোচর হয়—যিনি আকাশ ব্রহ্মের উপাসনা করেন। ইহা শুনিয়া নারদ বলিলেন, মহাশয়, আকাশ হইতে কি শ্রেষ্ঠ আছে? সনৎকুমার বলিলেন, আকাশ হইতে শ্রেষ্ঠ আছে। নারদ বলিলেন, মহাশয় তাহা আমাকে বলুন। ২। ১২।

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

স্মরো বা আকাশাদ্ভূয়স্তস্মাদ্যদ্যপিবহব আসীরন্ন স্মরন্তো নৈব তে কঞ্চন শৃণুয়ুর্ন মন্বীরন্ন বিজানীরন্ যদা বাব তে স্মরেয়ুরথ শৃণুয়ুরথ মন্বীরন্নথ বিজানীরন্ স্মরেণ বৈ পুত্রান্বিজানাতি স্মরেণ পশূন্ স্মরমুপাস্স্বেতি। ১।

'স্মরঃ' স্মরণং স্মরোঽন্তঃকরণধর্ম্মঃ 'বৈ আকাশাৎ ভূয়ঃ' স্মরণে হি সত্যাকাশাদিসর্ব্বমর্থবৎ স্মরণবতো ভোগ্যত্বাৎ। 'তস্মাৎ যদ্যপি বহবঃ' 'আসীরন্' একস্মিন্ উপবিশেয়ুস্তে তত্রাসীনা অন্যোন্যভাষিতমপি 'ন স্মরন্তঃ' চেৎ স্যুঃ 'ন এব তে কঞ্চন' শব্দং 'শৃণুয়ুঃ' তথা 'ন মন্বীরন্' মন্তব্যঞ্চেৎ স্মরেয়ুস্তদা মন্বীরন্ স্মৃত্যভাবত্বান্ন মন্বীরন্ তথা 'ন বিজানীরন্' 'যদা বাব তে স্মরেয়ুঃ অথ শৃণুয়ুঃ অথ মন্বীরন্ অথ বিজানীরন্' তথা 'স্মরেণ বৈ পুত্রান্ বিজানাতি' মম পুত্রা এতে ইতি পুত্রান্ বিজানাতি 'স্মরেণ পশূন্' 'স্মরং উপাস্ব ইতি'। ১।

স্মৃতি আকাশ হইতে শ্রেষ্ঠ। স্মৃতির অস্তিত্বেই আকাশাদি সকলের অস্তিত্বের বোধ হয়। অতএব যদ্যপি স্মৃতিবিহীন বহুজনও একত্র অবস্থান করিয়া বাক্যালাপ করে তথাপি কেহ কাহারও কথা শুনিতে পায় না, মনন করিতে পায় না, কেহ কাহাকে জানিতে পায় না। যখন তাহারা স্মৃতিযুক্ত হয় তখন তাহারা শুনে, মনন করে, জানে। স্মৃতিবলেই 'ইহারা আমার পুত্র' বলিয়া জানিতে পারে; স্মৃতির বলেই 'ইহারা পশু' বলিয়া পশুদিগকে জানিতে পারে। অতএব তুমি স্মৃতির উপাসনা কর। ১।

স যঃ স্মরং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে যাবৎ স্মরস্য গতং তত্রাস্য যথা কামচারো ভবতি যঃ স্মরং ব্রহ্মেত্যুপাস্তেঽস্তি ভগবঃ স্মরাদ্ভূয় ইতি স্মরাদ্বাব ভূয়োঽস্তীতি তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি। ২। ১৩।

'সঃ যঃ স্মরং ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে যাবৎ স্মরস্য গতং তত্র অস্য যথা কামচারঃ ভবতি যঃ স্মরং ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে' 'অস্তি ভগবঃ স্মরাৎ ভূয়ঃ ইতি' 'স্মরাৎ বাব ভূয়ঃ অস্তি ইতি' 'তৎ মে ভগবান্ ব্রবীতু ইতি'। ২। ১৩

যিনি স্মৃতিব্রহ্মের উপাসনা করেন, যতদূর স্মৃতির গোচর, কামচারী রাজার ন্যায় ততদূর তাঁহার গোচর হয়—যিনি স্মৃতি ব্রহ্মের উপাসনা করেন। ইহা শুনিয়া নারদ বলিলেন, মহাশয়, স্মৃতি হইতেও কি শ্রেষ্ঠ আছে? সনৎকুমার বলিলেন, স্মৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ আছে। নারদ বলিলেন, মহাশয় তাহা আমাকে বলুন। ২। ১৩।

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

আশা বাব স্মরাদ্ভূয়স্যাশেদ্ধো বৈ স্মরো মন্ত্রানধীতে কর্ম্মাণি কুরুতে পুত্রাংশ্চ পশূংশ্চেচ্ছত ইমঞ্চ লোকমমুঞ্চেচ্ছত আশামুপাস্স্বেতি। ১।

'আশা বাব স্মরাৎ ভূয়সী' অপ্রাপ্তবস্ত্বাকাঙ্ক্ষা আশা তৃষ্ণা কাম ইতি যামাহুঃ পর্য্যায়ৈঃ। সা চ স্মরাৎ ভূয়সী। 'আশেদ্ধঃ' আশয়াঽভিবর্দ্ধিতঃ 'বৈ স্মরঃ' স্মরভূতঃ স্মরন্ ঋগাদীন্ 'মন্ত্রান্ অধীতে' অধীত্য 'কর্ম্মাণি কুরুতে' তৎফলাশয়ৈব 'পুত্রান্ চ পশূন্ চ' কর্ম্মফলভূতানি 'ইচ্ছতে'। 'ইমং চ' লোকং 'অমুং চ' লোকং 'ইচ্ছতে' অতঃ 'আশাং উপাস্ব ইতি'। ১।

আশা স্মৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ। আশাতে অভিবর্দ্ধিত হইয়া ঋগাদি স্মরণ করে, মন্ত্রাধ্যয়ন করে, হোমাদি কর্ম্ম করে, তৎ-কর্ম্মফলস্বরূপ পুত্র পশু লাভেচ্ছা করে; ইহলোক এবং পরলোক লাভের ইচ্ছা করে। তুমি আশার উপাসনা কর। ১।

স য আশাং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে আশয়াঽস্য

সর্ব্বে কামাঃ সমৃদ্ধ্যন্ত্যমোঘা হাস্যাশিষো ভবন্তি যাবদাশায়া গতং তত্রাস্য যথা কামচারো ভবতি য আশাং ব্রহ্মেত্যুপাস্তেঽস্তি ভগব আশায়া ভূয় ইত্যাশায়া বাব ভূয়োঽস্তীতি তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি। ২। ১৪।

'সঃ যঃ আশাং ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে' 'অশয়া অস্য' সদোপাসীতয়াস্যোপাসকস্য 'সর্ব্বে কামাঃ' 'সমৃদ্ধ্যন্তি' সমৃদ্ধিং গচ্ছন্তি 'অমোঘা হ অস্য' 'আশিষঃ' প্রার্থনাঃ সর্ব্বাঃ 'ভবন্তি' যৎ প্রার্থিতং সর্ব্বং তদবশ্যং ভবতীত্যর্থঃ। 'যাবদাশায়া গতং' ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ। ২। ১৪।

যিনি আশা ব্রহ্মের উপাসনা করেন, সেই আশার উপাসনা বলে সকল কামনা তাঁহার সুসিদ্ধ হয়, তাঁহার প্রার্থনা অমোঘ হয়। যতদূর আশার গোচর কামচারী রাজার ন্যায় ততদূর তাঁহার গোচর হয়— যিনি আশা ব্রহ্মের উপাসনা করেন। ইহা শুনিয়া নারদ বলিলেন, মহাশয় আশা হইতে কি শ্রেষ্ঠ আছে? সনৎকুমার বলিলেন আশা হইতে শ্রেষ্ঠ আছে। নারদ বলিলেন, মহাশয় তাহা আমাকে বলুন। ২। ১৪।

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

প্রাণো বা আশায়া ভূয়ান্ যথা বা অরা নাভৌ সমর্পিতা এবমস্মিন্ প্রাণে সর্ব্বং সমর্পিতং প্রাণঃ প্রাণেন যাতি প্রাণঃ প্রাণং দদাতি প্রাণায় দদাতি প্রাণো হ পিতা প্রাণো মাতা প্রাণো ভ্রাতা প্রাণঃ স্বসা প্রাণ আচার্য্যঃ প্রাণো ব্রাহ্মণঃ। ১।

'প্রাণঃ বৈ আশায়াঃ ভূয়ান্' 'যথা বৈ' লোকে রথচক্রস্য 'অরাঃ' 'নাভৌ' রথনাভৌ 'সমর্পিতাঃ' সম্প্রবেশিতাঃ 'এবং অস্মিন্ প্রাণে সর্ব্বং সমর্পিতং' অতঃ এব 'প্রাণঃ' অপরতন্ত্রঃ 'প্রাণেন' স্বশক্ত্যৈব 'যাতি' নান্যকৃতগমনাদিক্রিয়া স্বস্য সামর্থ্যমিত্যর্থঃ। সর্ব্বং ক্রিয়াকারকফলভেদজাতং প্রাণএব ন প্রাণাদ্বহির্ভূতমস্তীতি প্রকরণার্থঃ। 'প্রাণঃ প্রাণং দদাতি' যদ্দদাতি তৎস্বাত্মভূতমেব যস্মৈ দদাতি তদপি 'প্রাণায় দদাতি' অতঃ পিত্রাদ্যাখ্যোঽপি প্রাণএব। 'প্রাণঃ হ পিতা' 'প্রাণঃ মাতা প্রাণঃ ভ্রাতা প্রাণঃ স্বসা' 'প্রাণঃ আচার্য্যঃ প্রাণঃ ব্রাহ্মণঃ'। ১।

প্রাণ আশা হইতে শ্রেষ্ঠ। যেমন রথচক্রের অর সকল চক্রনাভিতে অর্পিত থাকে সেইরূপ প্রাণে সকলই অর্পিত থাকে। প্রাণ আত্মশক্তি দ্বারাই গমন করে, প্রাণ প্রাণই প্রদান করে, প্রণকে প্রদান করে। অতএব প্রাণই পিতা, প্রাণ মাতা, প্রাণ ভ্রাতা, প্রাণ স্বসা, প্রাণ আচার্য্য, প্রাণ ব্রাহ্মণ। ১।

স যদি পিতরং বা মাতরং বা ভ্রাতরং বা স্বসারং বাচার্য্যং বা ব্রাহ্মণং বা কিঞ্চিদ্ভৃশমিব প্রত্যাহ ধিক্ত্বাঽস্ত্বিত্যেবৈনমাহুঃ পিতৃহা বৈ ত্বমসি স্বসৃহা বৈ ত্বমস্যাচার্য্যহা বৈ ত্বমসি ব্রাহ্মণহা বৈ ত্বমসি। ২।

'সঃ' যঃ কশ্চিৎ 'যদি পিতরং বা মাতরং বা ভ্রাতরং বা স্বসারং বা আচার্য্যং বা ব্রাহ্মণং বা' 'কিঞ্চিৎ ভৃশং ইব' তদননুরূপমিব কিঞ্চিদ্বচনং 'প্রত্যাহ' ধিক্ ত্বা অস্তু ইতি এব এনং' পার্শ্বস্থাঃ 'আহুঃ' 'পিতৃহা বৈ ত্বং অসি মাতৃহা বৈ ত্বং অসি ভ্রাতৃহা বৈ ত্বং অসি স্বসৃহা বৈ ত্বং অসি আচার্য্যহা বৈ ত্বং অসি ব্রাহ্মণহা বৈ ত্বং অসি'। ২।

যদি কোন ব্যক্তি পিতাকে বা মাতাকে বা ভ্রাতাকে বা ভগিনীকে বা আচার্য্যকে বা ব্রাহ্মণকে তাঁহাদের অননুরূপ বাক্য বলে তবে নিকটস্থ লোকেরা সেই ব্যক্তিকে বলে যে, তোমাকে ধিক্! তুমি পিতৃহন্তা, তুমি মাতৃহন্তা, তুমি ভ্রাতৃহন্তা, তুমি স্বসৃহন্তা, তুমি আচার্য্যহন্তা, তুমি ব্রাহ্মণহন্তা। ২।

অথ যদ্যপ্যেনানুৎক্রান্তপ্রাণাঞ্ছূলেন সমাসং ব্যতিসন্দহেন্নৈবৈনং ব্রূয়ুঃ পিতৃহাসীতি নমাতৃহাসীতি নভ্রাতৃহাসীতি ন স্বসৃহাসীতি নাচার্য্যহাসীতি ন ব্রাহ্মণহাসীতি। ৩।

'অথ যদ্যপি এনান্ উৎক্রান্তপ্রাণান্' ত্যক্তদেহান্ 'শূলেন' 'সমাসং' সমস্য পুঞ্জীকৃত্য 'ব্যতিসন্দহেৎ' ব্যত্যস্য সন্দহেদেবমতিক্রূরমপি কর্ম্ম সমাসব্যত্যাসাদিপ্রকারেণ দহনলক্ষণং তদ্দেহসম্বন্ধমেব কুর্ব্বাণং 'ন এব এনং' 'ব্রূয়ুঃ' 'পিতৃহা অসি ইতি' 'ন মাতৃহা অসি ইতি' 'ন ভ্রাতৃহা অসি ইতি' 'ন স্বসৃহা অসি ইতি' 'ন আচার্য্যহা অসি ইতি' 'ন ব্রাহ্মণহা অসি ইতি'।

আর যদ্যপি কেহ ইহাদের প্রাণহীন দেহ শূলে ছেদন করত তাহা পুঞ্জীভূত করিয়া অগ্নিতে দহন করে তাহা হইলে সেই দহন কারীকে এমন কথা কেহ বলে না যে, তুমি পিতৃহন্তা, তুমি মাতৃহন্তা, তুমি ভ্রাতৃহন্তা, তুমি স্বস্হন্তা, তুমি আচার্য্যহন্তা, তুমি ব্রাহ্মণহন্তা। ৩।

সার সত্যের আলোচনা।

ত্রিকের তারতম্য এবং সামঞ্জস্য।

বিগত-বারের সমালোচনায় এটা বেশ বুঝিতে পারা গিয়াছে যে, সত্তা, শক্তি এবং জ্ঞান, এই তিন মৌলিক পদার্থের প্রত্যেকেই অপর দুইটির সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধসূত্রে জড়িত—এরূপ ওতপ্রোত ভাবে জড়িত যে, একটিকে টানিলেই অপর দুইটিতে টান পড়ে।

কোনো ব্যক্তি তর্কের তোড়ে বলিতে পারেন যে, "আমি কেবল সত্তা মানি—শক্তিও মানি না, জ্ঞানও মানি না" ; অথবা "আমি কেবল শক্তি মানি—সত্তাও মানি না, জ্ঞানও মানি না" ; অথবা, "আমি কেবল জ্ঞান মানি—সত্তাও মানি না, শক্তিও মানি না"। মুখে তিনি তাহা বলিতে পারেন, কিন্তু মুখের কথায় কাহার কি আসে যায় ? কাজে তিনি একটিও এমন সত্তাবৎ বস্তু (সংক্ষেপে—সদ্‌বস্তু), বা জ্ঞান-পদার্থ, বা শক্তি-পদার্থ আমাকে দেখা'ন্ দেখি, যাহা অপর দুইটির কোনো ধারই ধারে না ? যতই ধস্তাধস্তি করুন্ না কেন—কিছুতেই তাহা তিনি পারিয়া উঠিবেন না। তিনি হয় তো একজন মস্ত বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত ;—আমার স্পর্দ্ধাবাক্য শুনিয়া তিনি হয় তো মনে মনে হাসিবেন ; তিনি হয় তো বলিবেন—"জ্যামিতি-পুস্তকের পাত-উল্টানো বোধ করি হয় নাই ! জ্যামিতিক রেখা কাহাকে বলে, তাহা জানো ? যাহার দৈর্ঘ্য আছে—প্রস্থ নাই, তাহাই রেখা। প্রস্থবিহীন দৈর্ঘ্য যদি তোমার দেখিবার ইচ্ছা হয়, তবে কিছুকাল ধরিয়া জ্যামিতি-বিদ্যার মন্ত্রপূত অঞ্জনে তোমার জ্ঞানচক্ষুকে মার্জ্জিত কর, তাহা হইলেই অবলীলাক্রমে তুমি তাহা দেখিতে পাইবে ; আর, তখন তুমি বুঝিতে পারিবে যে, জ্যামিতিক রেখা শুধুকেবল জ্ঞানেরই ব্যাপার—তাহা সত্তারও কোনো ধার ধারে না—শক্তিরও কোনো ধার ধারে না। রেখাও যেমন, সমতাও তেমনি, দুই-ই নিছক জ্ঞানেরই ব্যাপার ; আর, সমস্ত জ্যামিতি-বিদ্যা ঐ দুই অতীব সূক্ষ্ম—যেমন সূক্ষ্ম তেমনি দৃঢ়—ভিত্তিমূলের উপরে প্রতিষ্ঠিত। তা ছাড়া, যন্ত্রবিদ্যার (Mechanics এর) ক-খ'র সঙ্গে যদি তোমার ঘুণাক্ষরেও পরিচয় থাকিত, তাহা হইলে বলিবামাত্রই বুঝিতে পারিতে যে, গতিরই সঙ্গে গতি মেশামিশি করে, গতিরই সঙ্গে গতি যোঝাযুঝি করে, গতিরই সঙ্গে গতি বেগ বিনিময় করে ; গতির সমস্ত সম্বন্ধ স্বজাতির মধ্যেই—গতির মধ্যেই—আবদ্ধ ; তাহা নিছক শক্তিরই ব্যাপার ; তাহা জ্ঞানেরও সহিত কোনো সংস্রব রাখে না—সত্তারও সহিত কোনো সংস্রব রাখে না।" বুঝিলাম ! ইনি যদি আমার স্পর্দ্ধা মার্জ্জনা করেন, তবে ইঁহাকে একটি কথা আমি জিজ্ঞাসা করিতে চাই :—

জ্যামিতি-বিদ্যা কি তাঁহার মুখস্থ-বিদ্যা-মাত্র—না আর-কিছু ? শুধুই যদি তাহা মুখস্থ-বিদ্যা হয়, তাহা হইলে মুখে "রেখা" "সমতা" প্রভৃতি কতকগুলা বাঁধি-গৎ উচ্চারণ করিলেই সে বিদ্যার যথেষ্ট পরিচয় দেওয়া হয়—মনে কিছু না ভাবিলেও চলে। তাহা যদি না হয়—জ্যামিতি-বিদ্যা শুধুই

যদি মুখস্থ-বিদ্যা না হয়, তবে মুখে রেখা-শব্দ-উচ্চারণ করিবার পূর্ব্বে মনে রেখা ভাবনা করা আবশ্যক ;—দোকানের বহির্দ্বারের ললাটে জমকালো অক্ষরে "কাশ্মীরি শাল" মুদ্রাঙ্কিত করিবার পূর্ব্বে দোকানের ভিতর-মহলে কাশ্মীরি শাল গুছাইয়া রাখা আবশ্যক। মনে রেখা ভাবনা করিতে গেলেই চিদাকাশে রেখা টানা ব্যতিরেকে আর কোনো উপায়ে তাহা সম্ভাবনীয় নহে। অতএব প্রতিবাদীর জ্যামিতি-বিদ্যা শুধুই যদি মুখস্থ বিদ্যা না হয়, তবে মুখে রেখা-শব্দ উচ্চারণ করিবার পূর্ব্বে মনের আলেখ্য-পটে মনে মনে একটা রেখা টানা তাঁহার পক্ষে নিতান্তই আবশ্যক। মনের আলেখ্য-পটে মনে মনে রেখা টানা একপ্রকার ক্রিয়া—মানসিক ক্রিয়া। ক্রিয়া মাত্রই শক্তিস্ফূর্ত্তি। তবেই হইতেছে যে, "জ্যামিতিক-রেখা শুধুই কেবল জ্ঞানের ব্যাপার—শক্তির সহিত মূলেই তাহার কোনো সম্পর্ক নাই" এরূপ একটা কথা নিতান্তই গায়ের জোরের কথা, তাহা যুক্তির বড়-একটা ধার ধারে না। তোমার জ্যামিতিক-রেখার তো এই দশা—তাহার আবার একটা দোসর জুটিয়াছে সমতা !

দুটা রেখা দেখিবামাত্রই—না ভাবিয়া না চিন্তিয়া—আমি যদি বলি যে, উভয়ে পরস্পরের সহিত সমান, তবে তাহা আমার একটা মুখের কথামাত্র হইয়াই ক্ষান্ত থাকিবে। পক্ষান্তরে, আমি যদি রেখা-দুটাকে পরস্পরের গায়ে-গায়ে মিলাইয়া মাপিয়া দেখিয়া, অথবা, সে-দুটাকে একে-একে তৃতীয় কোনো রেখার গায়ে-গায়ে মিলাইয়া মাপিয়া দেখিয়া বলি যে, উভয়ে পরস্পরের সহিত সমান, তাহা হইলেই আমার মুখের কথার সহিত মনের কথার মিল থাকিবে। মনে মনে মানসিক রেখা-দ্বয়কে গায়ে-গায়ে মিলানো একপ্রকার যোজনা-ক্রিয়া—মানসিক যোজনা-ক্রিয়া। মানসিক যোজনা-ক্রিয়া মনের শক্তিস্ফূর্ত্তি, তাহাতে আর ভুল নাই। তবে-আর কেমন করিয়া বলিব যে, জ্যামিতিক সমতা শুধুই কেবল জ্ঞানের ব্যাপার—শক্তির সহিত মূলেই তাহার কোনো সম্পর্ক নাই ? জ্যামিতিক রেখা, তথৈব জ্যামিতিক সমতা, জ্ঞানের ব্যাপার তাহা কে না স্বীকার করিবে ? কিন্তু তা ছাড়া, দুইই তলে-তলে শক্তির ব্যাপার, এ কথাটিও স্বীকার করা চাই—তা নহিলে নিস্তার নাই। প্রধান দুইটি জ্ঞান-ঘ্যাঁসা পদার্থ, রেখা এবং সমতা, শক্তির সহিত কিরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধসূত্রে জড়িত—এই তো তাহা কষামাজা করিয়া দেখা গেল ; অতঃপর, দুইই বাস্তবিক সত্তার সহিত কিরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধসূত্রে জড়িত, তাহা কষিয়া-মাজিয়া দেখা যা'ক্।

ইউক্লিড্ তাঁহার জ্যামিতির চতুর্থ প্রস্তাবের গোড়াতেই বলিতেছেন—"অমুক ত্রিভুজকে অমুক ত্রিভুজের গাত্রে যোজনা (apply) কর।" তুমি বলিবে যে, ইউক্লিড্ ত্রিভুজ-দুটাকে মনে মনে পরস্পরের সহিত যোজনা করিতে বলিতেছেন। আমিও তাহাই বলি। কিন্তু আবার এটাও বলি যে, ত্রিভুজ-দুটাকে যদি দৃঢ়বস্তু (rigid body) বলিয়া ভাবনা করা না যায়, তবে মনে-মনেও সে-দুটাকে গায়ে-গায়ে মিলাইয়া মাপিয়া দেখা কাহারো কর্ত্তৃক সম্ভাবনীয় নহে। ক-গোলাটিকে তুমি মনে মনে ক-স্থান হইতে খ-স্থানে সরাইয়া রাখিতে পার—ইহা কেহই অস্বীকার করিতেছে না ; কিন্তু ক-গোলা আকাশের যে স্থানটি ভরাট্ করিয়া রহিয়াছে, সেই গোলাকৃতি শূন্য স্থানটিকে (Globular space) টিকে মনে মনে খ-স্থানে সরাইয়া রাখো দেখি—কখনই

তাহা তুমি পারিবে না। অতএব এটা স্থির যে, যে-সময়ে আমি মনে মনে দুই বস্তুকে পরস্পরের গায়ে-গায়ে মিলাইয়া মাপিয়া দেখিতে যাই, সে সময়েও মাপ্য বস্তু দুটাকে দৃঢ়বস্তু (rigid body) বলিয়া না ভাবিলে চলিতে পারে না; কেন না, বায়ুর ন্যায় উড়া বস্তু দ্বয়কে, অথবা, জলের ন্যায় তরল বস্তুদ্বয়কে মনে-মনেও—কল্পনাতেও—গায়ে-গায়ে মিলাইয়া মাপিয়া দেখা কাহারো কর্ত্তৃক সম্ভাবনীয় নহে। ফলে, সমস্ত বস্তুই যদি বায়ুর ন্যায় অদৃঢ় হইত, তাহা হইলে কাহারো মনোমধ্যে "জ্যামিতিক সমতা" বলিয়া একটা ভাব বদ্ধমূল হইতে পারা দূরে থাকুক্—দাঁড়াইতেই পারিত না, ইহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে। কাজেই বলিতে হইতেছে যে, জ্যামিতিক সমতা দৃঢ়বস্তুর সত্তার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ-সূত্রে জড়িত। এ সম্বন্ধে আর-একটি বিষয় দ্রষ্টব্য এই যে, "একটা বস্তু" বা "একটি বস্তু" বলিতে দৃঢ়-বস্তুই বুঝায়—অদৃঢ়-বস্তু বুঝায় না। তার সাক্ষী, দৃঢ়-বস্তুর ব্যালা আমরা বলি "একটি টাকা" "একটা লাঠি" ইত্যাদি, অদৃঢ়-বস্তুর ব্যালা বলি "একঘটি জল" "একঘর ধোঁয়া" ইত্যাদি। শেষোক্তের ব্যালা "একটি জল" বা "একটা ধোঁয়া" এরূপ বাক্য প্রয়োগ করিলে তাহার অর্থ খুঁজিয়া পাওয়া ভার হয়। অর্থ খুঁজিয়া পাইবার পক্ষে বাধা কি? বাধা যে কি তাহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে;—অদৃঢ়-বস্তুর আয়তনের পরিমাণ স্থির রাখিতে হইলে তাহাকে দৃঢ়-বস্তু দিয়া ঘেরাও করা ব্যতিরেকে অন্য কোনো উপায়ে তাহা সম্ভাবনীয় নহে। আমরা যেমন বলি "একটি টাকা," তেমনি বলি "একটি রেখা"; ইহাতেই ভাবে বুঝা যাইতেছে যে, রেখা বলিতে আমরা দৃঢ়-রেখাই বুঝি।

ভাবে এ যাহা বুঝা যায়—যুক্তিতেও তাহাই পাওয়া যায়। যুক্তি এইরূপ:—

(১) রেখার আরেক নাম দৈর্ঘ্য।

(২) দৈর্ঘ্যমাত্রেরই নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ থাকা চাই।

(৩) দৃঢ়-বস্তুর বিনা সাহায্যে অদৃঢ়-বস্তুর দৈর্ঘ্যকে (বায়ুর দৈর্ঘ্যকে বা জলের দৈর্ঘ্যকে) নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে আটক করিয়া রাখা সম্ভবে না।

(৪) কাজেই নির্দ্দিষ্টপরিমাণ দৈর্ঘ্য বা রেখা ভাবনা করিতে গেলেই সেই সঙ্গে দৃঢ়-বস্তুর ভাবনা আপনা-আপনি আসিয়া পড়ে।

এখন দ্রষ্টব্য এই যে, আমি যদি বলি "দৈর্ঘ্য একপ্রকার গুণ—সুতরাং তাহা বস্তু-সাপেক্ষ," তবে তাহার উত্তরে তুমি অনায়াসে বলিতে পার যে, দৈর্ঘ্য গুণ বটে, কিন্তু তাহা বস্তুর গুণ নহে—তাহা একপ্রকার অবস্তুর গুণ—শূন্য আকাশের গুণ। স্বীকার করিলাম যে, দৈর্ঘ্য শূন্য আকাশের গুণ—কিন্তু দৃঢ়তা তো আর শূন্য আকাশের গুণ নহে। দৃঢ়তা দৃঢ়বস্তুরই গুণ, তাহাতে আর ভুল নাই। পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, নির্দ্দিষ্ট-পরিমাণ রেখা ভাবিতে গেলেই দৃঢ়-রেখা ভাবনা করিতে হয়; এখন দেখিতেছি যে, দৃঢ়তা বাস্তবিক পদার্থেরই গুণ, তা বই, তাহা শূন্য আকাশের গুণ নহে। তবেই হইতেছে যে, জ্যামিতিক রেখা দৃঢ়-বস্তুর বাস্তবিক সত্তার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধসূত্রে জড়িত। তোমার পক্ষের প্রধান দুইটি সাক্ষী হ'চ্চে জ্যামিতি-বিদ্যার রেখা এবং যন্ত্র-বিদ্যার গতি। রেখা-সাক্ষী নিরস্ত হইল—এখন গতি-সাক্ষী কি বলে, তাহা দেখা যা'ক্।

"গতি" বলিলে শুনিতে শুনায় একটি

মাত্র শব্দ, কিন্তু বুঝিতে বুঝায় দুইটি বিষয় একসঙ্গে—(১) চলমান বস্তু এবং (২) প্রতিমুহূর্ত্তে তাহার স্থান-পরিবর্ত্তন। স্থান-পরিবর্ত্তন শক্তিরই ব্যাপার, তাহাতে আর ভুল নাই। কিন্তু তাহা বলিয়া এটা ভুলিলে চলিবে না যে, চালক শক্তি চাল্য বস্তুর উপরেই কার্য্য করে—শূন্যের উপরে কার্য্য করে না। আপাতত মনে হইতে পারে যে, আলোক-পদার্থ,তথৈর তাড়িত-পদার্থ, নিছক গতি-ক্রিয়া; তাহার সহিত বাস্তবিক-পদার্থের মূলেই কোনো সম্পর্ক নাই। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, ও-সকল বৈদ্যুতিক গতি একপ্রকার সূক্ষ্ম পদার্থের তরঙ্গলীলা—ঈথ-রের তরঙ্গলীলা।

কোনো-কিছুরই গতি নহে—অথচ গতি, এরূপ গতি বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায় অস-ম্ভব। তবেই হইতেছে যে, গতি বস্তুসত্তার সহিত, অথবা, যাহা একই কথা—বাস্তবিক সত্তার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধসূত্রে জড়িত;—জ্ঞানেরও সহিত যে, তাহা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধসূত্রে জড়িত, তাহার প্রমাণ কি? তাহার প্রমাণ এই ঃ—

ক বস্তুর অচল অবস্থায় বা গতিশূন্য অবস্থায়, ক-বস্তু প্রতিমুহূর্ত্তেই ক-স্থান ভরাট্ করিয়া অবস্থিতি করে। পক্ষান্তরে, ক-বস্তুর সচল অবস্থায়, সে ক-স্থান খালি করিয়া খ-স্থান ভরাট্ করে, খ-স্থান খালি করিয়া গ-স্থান ভরাট্ করে, ইত্যাদি। এখন দ্রষ্টব্য এই যে, ক-স্থান যদি ক্রমাগতই ক-বস্তুর সত্তায় ভরাট্ থাকে, তাহা হইলে ক-স্থানে ক-বস্তুর গতি থাকিতে পারে না; তেমনি আবার, খ-স্থান যদি ক্রমাগতই খালি থাকে, তবে খ স্থানেও ক-বস্তুর গতি থাকিতে পারে না। ক-বস্তুর গতি তবে থাকে কোন্ স্থানে? যখন ভরাট্ স্থান খালি হইবামাত্র খালি-স্থান ভরাট্ হয়—যখন ক-স্থান খালি হইবামাত্র খ-স্থান ভরাট্ হয়—তখনই ক-বস্তুর গতি খালি-স্থানে এক পা রাখিয়া ভরাট্ স্থানে আরেক পা বাড়ায়। তবেই হইতেছে যে, গতি দাঁড়াইয়া থাকে অতীব একটি সঙ্কট-স্থানে? এক দিকে, অব্যবহিত পূর্ব্বমুহূর্ত্তে যাহা ভরাট্ ছিল, কিন্তু এখন খালি হই-য়াছে, সেই খালি-স্থান; আর-এক দিকে, বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে যাহা বস্তু-সত্তায় ভরাট্ হইল,সেই ভরাট্ স্থান; এই যে দুই নৌকা—খালি এবং ভরাট্, এই দুই নৌকায় পা দিয়া—ভেল্কিবাজ গতি দুয়ের সন্ধিস্থানে দাঁড়া-ইয়া থাকে। এখন দ্রষ্টব্য এই যে, সেই যে খালি-স্থান—যাহাতে এক পায়ের ভর না রাখিলে গতির গতিত্ব হয় না—সে খালি-স্থান বস্তুটা কি? তাহা শূন্য আকাশমাত্র; তাহা বস্তুহিসাবেও কিছুই না—শক্তি-হিসাবেও কিছুই না; তাহা জ্ঞানেরই ব্যাপার। তবেই হইতেছে যে, গতি বলিয়া যে একটা ক্রিয়া, তাহা শক্তি এবং সত্তার সঙ্গেও যেমন—জ্ঞানের সঙ্গেও তেমনি—উভয়েরই সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধসূত্রে জড়িত। এ যাহা অতীব সংক্ষেপে বলিলাম, তাহা আর-একটু বিস্তার করিয়া না বলিলে—কথাটা হয় তো পাঠকের মনের ধারণা হইতে ফস্কিয়া যাইবে। অতএব ঐ কথাটিই আর-একটু খোলসা করিয়া বলি ঃ—

একটা পাখী যখন চক্ষের সম্মুখ দিয়া উড়িয়া চলিতেছে, তখন তদ্দৃষ্টে কেহ ব-লিতে পারেন যে, "আমি ঐ পাখীটার গতি চক্ষে দেখিতেছি"। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, তিনি প্রত্যেক মুহূর্ত্তে সেই মুহূর্ত্তের ভরাট্ স্থানটিই কেবল চক্ষে দেখিতেছেন, তা বই, অতিবাহিত-পূর্ব্ব খালি-স্থান তিনি চক্ষে দেখিতেছেন না। যাহা চক্ষে দেখা যায় না, তাহা তিনি কিরূপে চক্ষে দেখি-বেন? খালি-স্থান বস্তুশূন্য আকাশ—তাহা

তিনি কিরূপে চক্ষে দেখিবেন? এ কথা সত্য যে, তিনি প্রত্যেক মুহূর্ত্তেই একটি-না একটি ভরাট্ স্থান দেখিতেছেন; কিন্তু শুধুকেবল ভরাট্ স্থানেই তো আর গতি হয় না; পূর্ব্বপূর্ব্ববর্ত্তী স্থান খালি হইবার সঙ্গে সঙ্গে পরপরবর্ত্তী স্থান ভরাট্ হইতে থাকিলে, সেইরূপ ক্রিয়াকেই আমরা গতি নামে নির্দ্দেশ করি। তবেই হইতেছে যে, দর্শক ভরাট্ স্থানই চক্ষে দেখিতেছেন—গতি চক্ষে দেখিতেছেন না। তবে কেন তিনি বলেন যে, "আমি ঐ পাখীটার গতি দর্শন করিতেছি"। তাহা যে তিনি বলেন কেন, তাহার বিশেষ একটি কারণ আছে; তাহা এই:—

অতিবাহিত স্থান বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে খালি হইয়াছে বটে, কিন্তু পূর্ব্বমুহূর্ত্তে তাহা ভরাট্ ছিল। তাহা যে পূর্ব্বমুহূর্ত্তে ভরাট্ ছিল, এ কথাটি দর্শকের স্মরণে মুদ্রাঙ্কিত রহিয়াছে। দর্শক করিতেছেন দুইটি কার্য্য—দর্শন এবং স্মরণ; "অতিবাহিত স্থান পূর্ব্বমুহূর্ত্তে ভরাট্ ছিল" এটা তিনি স্মরণ করিতেছেন; "অধিকৃত স্থান বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে ভরাট্ হইল" এইটিই তিনি দর্শন করিতেছেন। করিতেছেন দর্শন এবং স্মরণ দুইই একসঙ্গে; বলিতেছেন "দর্শন করিতেছি"। তাঁহার কথার ভাবে এইরূপ বুঝাইতেছে—যেন তিনি খালি-স্থান এবং ভরাট্ স্থান দুইই একসঙ্গে দেখিতেছেন। কিন্তু সে দেখা'র মধ্যে চক্ষের দেখাও আছে—জ্ঞানের দেখাও আছে। গতির মধ্যে জ্ঞানের ব্যাপার যেটা রহিয়াছে, সেটা তিনি জ্ঞানেই দেখিতেছেন। সেটা কি? না, শূন্য আকাশের সহিত সম্বন্ধ। পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, জ্যামিতিক রেখাও যেমন—জ্যামিতিক সমতাও তেমনি, দুইই, জ্ঞান শক্তি এবং সত্তা তিনেরই সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধসূত্রে জড়িত। এখন দেখিতে পাইতেছি যে, গতি বলিয়া যে একটা পদার্থ তাহাও জ্ঞান শক্তি এবং সত্তা তিনেরই সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধসূত্রে জড়িত।

এ কথা আমি অস্বীকার করি না যে, জ্যামিতিক রেখা প্রধানত একটা মনের ভাব সুতরাং তাহা জ্ঞানপ্রধান; গতি প্রধানত একপ্রকার ভৌতিক ক্রিয়া, সুতরাং তাহা শক্তিপ্রধান। আমার মনোগত অভিপ্রায় শুদ্ধকেবল এইটি দেখানো যে, জ্যামিতিক রেখা জ্ঞানপ্রধান হইলেও জ্ঞানই যে তাহার সর্ব্বস্ব তাহা নহে—তলে-তলে তাহা শক্তি এবং সত্তার সহিত অবিমোচ্য সম্বন্ধসূত্রে জড়িত; তেমনি, গতি শক্তিপ্রধান হইলেও শক্তিই যে তাহার সর্ব্বস্ব তাহা নহে—তলে-তলে তাহা সত্তা এবং জ্ঞানের সহিত অবিমোচ্য সম্বন্ধসূত্রে জড়িত।

অতঃপর দ্রষ্টব্য এই যে, পৃথিব্যাদি বস্তু সত্তাপ্রধান হইলেও তলে-তলে তাহা শক্তি এবং জ্ঞানের সহিত অবিমোচ্য সম্বন্ধসূত্রে জড়িত।

আমরা যখন বলি যে, পৃথিবীর পরমাণুপুঞ্জ তাহার কেন্দ্রের চতুর্দ্দিকে জমাট্‌বদ্ধ হইয়া গোলাকারে বিধৃত রহিয়াছে, তখন আমরা মনে মনে পৃথিবীর পরমাণু-নিচয়কে পরস্পর হইতে বিশ্লেষিত করি এবং তাহার পরে সেই বিশ্লেষিত পরমাণুগণকে গোলাকারে সংহিত করি। ইহারি নাম সঙ্কল্প-বিকল্প। সঙ্কল্প-বিকল্প আর-কিছু না—এক-প্রকার মানসিক ভাঙন গড়ন। কিন্তু এটা ভুলিলে চলিবে না যে, আমাদের মানসিক-শক্তি-চালনার বহুপূর্ব্ব হইতে পৃথিবীর পরমাণুপুঞ্জ আকর্ষণী এবং বিকর্ষণী শক্তির কার্য্যকারিতায় স্বস্ব স্থানে বিধৃত হইয়া স্বস্ব কার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছে। আমাদের জন্মিবার পূর্ব্বে পৃথিবীর পরমাণুপুঞ্জ অনেকানেক যুগযুগান্তর ধরিয়া কোটিকোটি

'যোজন আকাশ' হইতে আকাশান্তরে পরিব্যাপ্ত ছিল, ক্রমে ক্রমে ক্রমে তাহা সংহত হইয়া-হইয়া এক্ষণে রূপ-ধরিয়াছে গোলাকৃতি এবং নাম-ধরিয়াছে পৃথিবী। এ ভাঙন-গড়ন মানসিক ভাঙন-গড়ন নহে—এ ভাঙন-গড়ন বাস্তবিক ভাঙন-গড়ন। মানসিক ভাঙন-গড়ন যেমন মনের শক্তিস্ফূর্ত্তি—বাস্তবিক ভাঙন-গড়ন তেমনি বাস্তবিক সত্তার শক্তিস্ফূর্ত্তি। সত্তার সহিত শক্তির সম্বন্ধ এইরূপ সুস্পষ্ট। সত্তার সহিত জ্ঞানের সম্বন্ধও তদ্বৎ। শক্তির কার্য্যই হ'চ্চে সত্তাকে বিবৃত করিয়া প্রকাশ করা; এবং সত্তার প্রকাশের নামই জ্ঞান। আমরা যদি অন্তরে দৃষ্টিপাত করি, তবে দেখিতে পাই যে, সঙ্কল্প-বিকল্প-রূপিণী মানসিক শক্তির পরিচালনা জ্ঞানেতেই পর্য্যবসিত হয়; আমরা যদি বাহিরে দৃষ্টিপাত করি, তবে দেখিতে পাই যে, বাস্তবিক সত্তার শক্তিস্ফূর্ত্তি জ্ঞানবান্ মনুষ্যের অভিব্যক্তি-তেই পর্য্যবসিত হয়।

উপরের আলোচনা হইতে মোট কথাটি যাহা সংগ্রহ করিয়া পাওয়া যাইতেছে, তাহা এই:—

যেমন রাজ্য বলিলেই রাজা এবং প্রজা-বর্গ, রাজা বলিলেই রাজ্য এবং প্রজাবর্গ, প্রজা বলিলেই রাজা এবং রাজ্য, আপনা-আপনি আসিয়া পড়ে; তেমনি সত্তা বলি-লেই শক্তি এবং জ্ঞান, শক্তি বলিলেই সত্তা এবং জ্ঞান, জ্ঞান বলিলেই সত্তা এবং শক্তি আপনা-আপনি আসিয়া পড়ে। পুনশ্চ রাজা যদি রাজ্যের সহিত সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়া বনে চলিয়া যা'ন; রাজ্য যদি রাজা'র সহিত সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়া অরাজক হইয়া উঠে; প্রজারা যদি রাজার সহিত সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়া স্বস্বপ্রধান হইয়া উঠে; তাহা হইলে যেমন রাজা অরাজা হইয়া যান, রাজ্য অরাজ্য হইয়া যায়, প্রজা অপ্রজা হইয়া পড়ে; তেমনি, জ্ঞান এবং শক্তি হইতে সম্বন্ধচ্যুত হইলে সত্তা অসত্তা হইয়া যায়; সত্তা এবং জ্ঞান হইতে সম্বন্ধ-চ্যুত হইলে শক্তি অশক্তি হইয়া যায়, সত্তা এবং শক্তি হইতে সম্বন্ধচ্যুত হইলে জ্ঞান অজ্ঞান হইয়া যায়। তবে এরূপ হইতে পারে যে, কোনো-বা রাজ্যে রাজার, কোনো-বা রাজ্যে প্রজাবর্গের, কোনো-বা রাজ্যে রাজপুরুষদিগের, কোনো বা রাজ্যে তিনের সামঞ্জস্যের বেশী প্রাদুর্ভাব। তার সাক্ষী—বর্ত্তমান অব্দে জর্ম্মণ-রাজ্যে রাজার, ফরাসী-রাজ্যে প্রজাবর্গের, ইংলণ্ডে রাজপুরুষ-দিগের এবং আমেরিকায় তিনের সামঞ্জস্যের অপেক্ষাকৃত বেশী প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। তত্ত্বজ্ঞানের ভারতখণ্ডে উহারই একপ্রকার উল্টাপিটের অঙ্কস্ফোট দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, শাঙ্কর-শাস্ত্রে জ্ঞানকে, কাপিল-শাস্ত্রে সত্তাকে, পাতঞ্জল-শাস্ত্রে আত্মশক্তিকে এবং গীতা-শাস্ত্রে তিনের সামঞ্জস্যকে সর্ব্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠান করানো হইয়াছে। তবে যে, আপাতদর্শী লোকের মনে সময়ে-সময়ে এইরূপ ভ্রম হয়—যেন বেদান্ত-শাস্ত্রে কেবলমাত্র জ্ঞান (শক্তি-ছাড়া এবং সত্তা-ছাড়া জ্ঞান), সাংখ্য শাস্ত্রে কেবলমাত্র সত্তা (শক্তি-ছাড়া এবং জ্ঞান-ছাড়া সত্তা), যোগ-শাস্ত্রে কেবলমাত্র আত্মশক্তি (সত্তা-ছাড়া এবং জ্ঞান-ছাড়া আত্মশক্তি) একাকী সর্ব্বেসর্ব্বা, সেরূপ ভ্রমের কারণ আর-কিছু না—অনভিজ্ঞ সমালোচকের চক্ষে প্রাধান্য-মাত্রই একাধিপত্যের আকার ধারণ করে। একজন অনভিজ্ঞ লোক যদি শোনে যে, আমেরিকা-রাজ্য প্রজাতন্ত্র, তবে তাহার মনোমধ্যে সহসা এইরূপ একটা ভ্রম জন্মিতে পারে যে, তবে বুঝি আমেরিকা-

রাজ্যে রাজকার্য্যের কোনোপ্রকার বিধান-ব্যবস্থা নাই। কেননা রাজাই যখন নাই—তখন রাজকার্য্যের বিধান-ব্যবস্থা "শিরো নাস্তি শিরঃপীড়া" ব্যতীত আর কি হইতে পারে? "রাজা নাই" বলিতেছ? আমেরিকা-রাজ্যের মস্তক যিনি—যাঁহার নাম প্রেসিডেণ্ট—তিনি তবে কি? তিনি রএ আকার রা, জএ আকার জা নহেন, ইহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে; কিন্তু তথাপি রাজার যাহা কার্য্য, তাহা তাঁহাকে ষোলো-আনা মাত্রায় করা চাই, রাজোচিত গুণ তাঁহার ষোলো-আনা মাত্রায় থাকা চাই, রাজোচিত সম্মান তাঁহাকে ষোলো-আনা মাত্রায় পাওয়া চাই;—তবে আর রাজার বাকি রহিল কি? তুমি বলিতেছ যে, শঙ্করাচার্য্যের মতে চরাচর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কিছুই না;—তবে কি তিনি "কিছুই না"-দলন করিবার জন্য দলবল সমভিব্যাহারে দিগ্বিজয়ে প্রবৃত্ত হইয়া সমস্ত ভারতবর্ষময় দাপাদাপি করিয়া বেড়াইয়াছিলেন? অতএব মুখে যিনি যাহা বলুন না কেন—সকলেই মনে মনে জানেন যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিলক্ষণই একটা-কিছু! শঙ্করাচার্য্য না হয় বলিলেন অবিদ্যা, কপিলমুনি না হয় বলিলেন প্রকৃতি, পুরাণতন্ত্রকর্ত্তারা না হয় বলিলেন শক্তি, তাহাতে কি আইসে যায়? নামে কি আইসে যায়? শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য তো "অবিদ্যা" বলিবেনই! তাঁহার শাস্ত্রে শুধু-কেবল জ্ঞানেরই সংস্থান রহিয়াছে, তা ছাড়া প্রকৃতির সংস্থান নাই; অথচ প্রকৃতি ব্যতিরেকে কোনো কাজই চলে না;—এমন কি জ্ঞানের কাজও চলে না। প্রকৃতিকে তিনি আপন শাস্ত্র হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছেন অথচ প্রকৃতি নহিলে কাজ চলে না। প্রকৃতিকে ছাড়িলে চলিবে না—প্রকৃতিকে পাওয়া চাই। পাওয়া যাইবে কিরূপে? শঙ্করাচার্য্য তাহার উপায় করিলেন এই যে, প্রকৃতিকে অজ্ঞান বা অবিদ্যা নামে অবগুণ্ঠিত করিয়া জ্ঞানেরই উল্টা-পিট বলিয়া গ্রহণ করা হো'ক্। অবিদ্যা'র গোড়া'তে অ রহিয়াছে, প্রকৃতির গোড়া'তে প্র রহিয়াছে। অ কিনা না—কিছুই না; প্র কিনা প্রধান—সর্ব্বপ্রধান বস্তু। নামে, এইরূপ, দুয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। কিন্তু কাজে শাঙ্কর-শাস্ত্রের অবিদ্যাও যা, সাংখ্য-শাস্ত্রের প্রকৃতিও তা, তন্ত্র-শাস্ত্রের শক্তিও তা—একই। প্রকৃত প্রস্তাব হইতে একটু যেন দূরে সরিয়া পড়া হইয়াছে, অতএব এখানে আর কালবিলম্ব না করিয়া গন্তব্যপথে প্রত্যাবর্ত্তন করা যা'ক্।

যদিও সত্তা, শক্তি এবং জ্ঞান পরস্পরের সহিত অবিমোচ্য সম্বন্ধসূত্রে জড়িত, তথাপি এরূপ হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে যে, কোনো বস্তু দেখিলে প্রধানত সত্তা চক্ষে পড়ে, কোনো বস্তু দেখিলে প্রধানত শক্তি চক্ষে পড়ে, কোনো বস্তু দেখিলে প্রধানত জ্ঞান চক্ষে পড়ে। অন্তঃকরণ-রাজ্যে প্রাণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সত্তা'র ভাব প্রধানত চক্ষে পড়ে; তার সাক্ষী—লোকে বলে "বেঁচে বর্ত্তে থাকা"। বর্ত্তিয়া থাকা (বর্ত্তমান থাকা) সত্তা'রই ধর্ম্ম। মনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে শক্তির ভাব প্রধানত চক্ষে পড়ে; তার সাক্ষী—লোকে বলে "মনের জোর"। বুদ্ধির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে জ্ঞানের ভাব প্রধানত চক্ষে পড়ে; তার সাক্ষী—লোকে বলে "বুদ্ধির পরামর্শ"। অন্তরিন্দ্রিয়-রাজ্যে এ যাহা দেখা গেল—বহিরিন্দ্রিয়-রাজ্যে দৃষ্টিপাত করিলে তাহারই আর-এক পিট স্পষ্টাক্ষরে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাহা দেখিতে হইলে স্পর্শেন্দ্রিয়ের অর্থের পরিধিকে আভিধানিক

সংজ্ঞার সীমা ছাড়াইয়া আর-একটু বেশীদূর বিস্তৃত করা আবশ্যক। আমরা দেখিতে পাই যে, হস্তের স্পর্শ যেমন হস্তের সহিত অব্যবহিতভাবে (অর্থাৎ মাখামাখি-ভাবে) গাত্রে অনুভূত হয়, রসের আস্বাদ তেমনি রসের সহিত অব্যবহিতভাবে রসনায় অনুভূত হয়; এবং পরিমলের ঘ্রাণ তেমনি পরিমলের সহিত অব্যবহিতভাবে নাসিকায় অনুভূত হয়। অতএব ইন্দ্রিয়ের বিষয় এবং ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার, এই দুয়ের মাখামাখি-ভাবকে যদি স্পর্শের বৈশেষিক লক্ষণ বলিয়া ধরা যায়, তবে ত্বক্‌, রসনা এবং নাসিকা, তিনকেই স্পর্শেন্দ্রিয়ের কোঠায় নিক্ষেপ করা যাইতে পারে। এখানে তাহাই করা হইল। এখন দ্রষ্টব্য এই যে, স্পর্শেন্দ্রিয়ে প্রাণ এবং সত্তার ভাব প্রধানত স্ফুরিত হয়; তার সাক্ষী—সুস্নিগ্ধ সমীরণের সংস্পর্শে, সুস্বাদু অন্নপানীয়ের আস্বাদনে, সুরভি পুষ্পের আঘ্রাণে লোকে বলে "প্রাণ ঠাণ্ডা হ'ল"। আর, সেইরূপ প্রাণ ঠাণ্ডা হওয়া গতিকে শরীরে একপ্রকার স্বাস্থ্য অনুভূত হয়। স্বাস্থ্য-শব্দের অর্থ হ'চ্চে আপনাতে আপনি স্থিতি;—তাহা সত্তারই ধর্ম্ম। শ্রবণেন্দ্রিয়ে প্রধানত মন এবং শক্তির ভাব স্ফুরিত হয়; তার সাক্ষী—"শোনো" এবং "মন দেও," এ দুয়ের মধ্যে অত্যল্পই প্রভেদ। তা ছাড়া, যুদ্ধক্ষেত্রে সিংহনাদ, ভেরীনির্ঘোষ, হল্লারব প্রভৃতি শব্দ স্বপক্ষদলের বাহুতে শক্তি সঞ্চার করে, এবং বিপক্ষদলের বাহু হইতে শক্তি হরণ করে। চক্ষুরিন্দ্রিয়ে প্রধানত বুদ্ধি এবং জ্ঞানের ভাব স্ফুরিত হয়; তার সাক্ষী—যদি বলা যায় "দেক্‌চ না, এটা কেবল একটা স্তোকবাক্য"; তবে "দেক্‌চ না" কথাটির অর্থ "বুঝ্‌তে পার্‌চ না" ছাড়া আর-কিছুই হইতে পারে না। মন এবং বুদ্ধির মধ্যে প্রভেদ যে, কিরূপ, তাহা বহুপূর্ব্বে বলিয়া চুকিয়াছি; শ্রবণেন্দ্রিয় এবং দর্শনেন্দ্রিয়ের মধ্যে তাহারই অবিকল প্রতিরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। মন যেমন ভাবের অনুবন্ধিতা-সূত্রে বিশেষ-বিশেষ হইতে বিশেষ-বিশেষে প্রধাবিত হয়, শ্রবণেন্দ্রিয় সেইরূপ ক হইতে খ-এ, খ হইতে গ-এ, গ হইতে ঘ-এ—এইরূপ ব্যষ্টি হইতে ব্যষ্টিতে প্রধাবিত হয়। পক্ষান্তরে, বুদ্ধি যেমন বিবিধপ্রকার বিশেষ-বিশেষ ব্যাপারকে সামান্যের অন্তর্ভূত করিয়া সামান্য এবং বিশেষ দুইকেই একযোগে অবধারণ করে, দর্শনেন্দ্রিয় সেইরূপ সমষ্টি এবং ব্যষ্টি—বন এবং বনস্থ বৃক্ষরাজি—দুইই একযোগে উপলব্ধি করে। এইরূপ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, দর্শনেন্দ্রিয় বুদ্ধিপ্রধান—এবং তা'রই নাম জ্ঞানপ্রধান; শ্রবণেন্দ্রিয় মনঃ-প্রধান—এবং তা'রই নাম শক্তি-প্রধান; স্পর্শেন্দ্রিয় প্রাণপ্রধান এবং তা'রই নাম সত্তাপ্রধান।

উপরে যাহা সংক্ষেপে—একপ্রকার সাঁটেসোঁটে—বলিলাম, তাহার সমস্ত বিবরণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুশীলন করিতে হইলে তাহা দুই-এক ছত্রের কর্ম্ম নহে; তাহার আলোচনায় অধ্যায়কে-অধ্যায় পার হইয়া যাইতে থাকিলেও—যতগুলা অধ্যায় ছাড়াইয়া আসা যাইবে, ততগুলা ভাবী অধ্যায়ের খোরাক জমা হইতে থাকিবে—কিছুতেই আর জের মিটিবে না। মাঝপথে কাল-বিলম্ব করা শ্রেয়স্কর নহে, তাহা আমি গোড়াতেই বলিয়াছি—বলিয়া-কহিয়া তবে এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। বর্ত্তমান প্রসঙ্গে এক্ষণে কেবল একটি বিষয় বলিবার আছে, সেইটি হইয়া চুকিলেই পাথেয়-সংগ্রহের দায় হইতে এ-যাত্রা'র মতো অব্যাহতি পাওয়া যাইতে পারে। সেটি

হ'চ্চে সত্তা, শক্তি এবং জ্ঞান, তিনের সামঞ্জস্য।

আমি যেরূপ ব্যক্তি এবং আমার যেরূপ শক্তি, তাহা ছাড়াইয়া আমার জ্ঞানের আদর্শ যদি এত উচ্চ হইয়া ওঠে যে, কোনো গতিকেই আমি তাঁহা হাত বাড়াইয়া নাগাল্ পাইতে পারি না, এক কথায়—জ্ঞান যদি সত্তা এবং শক্তিকে, প্রাণ এবং মনকে, অনেক হাত নীচে ফেলিয়া মহোচ্চ সত্যের শিখরে আরোহণ করে, তাহা হইলে আমার জ্ঞানের সেই উচ্চ আদর্শ আমার মধ্যে একপ্রকার উল্টা ফল উৎপাদন করিবে সন্দেহ নাই—আপন মহোজ্জ্বল আলোকে আমার অপদার্থতা এবং অক্ষমতা ফুটাইয়া-তুলিয়া আমার মনোমধ্যে অশান্তি এবং বিষাদের উৎস উন্মুক্ত করিয়া দিবে; তাহা করে করুক্—তথাপি জ্ঞানের আলোক আমার চক্ষের সম্মুখ হইতে একটুও সরাইয়া রাখা আমার প্রার্থনীয় হইতে পারে না। কেন না, তাহা করিলে আপাতত একপ্রকার মনকে-প্রবোধ-দেওয়া-রকমের শান্তি লাভ করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু তাহাতে উন্নতির দ্বারে কপাট পড়িয়া গিয়া তলে তলে অধোগতির সোপান প্রস্তুত হইতে থাকে। এরূপ স্থলে সৎপরামর্শ হ'চ্চে—নীচের নীচের ধাপ মাড়াইয়া জ্ঞানের উচ্চ-উচ্চ মঞ্চে শক্তিকে এবং সত্তাকে—মনকে এবং প্রাণকে—অল্পে অল্পে টানিয়া তোলা।

মনে কর, একজন চাসা'র বড়ই ইচ্ছা গিয়াছে যে, সে জমিদার হয়। সে আপনার লাঙলের কাজে জলাঞ্জলি দিয়া অষ্টপ্রহর কেবল জমিদারী সেরেস্তায় আনাগোনা করে, আর, সেই গতিকে জমিদারী কার্য্যের প্রণালী-পদ্ধতি-বিষয়ে তাহার অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে মন্দ না। কিন্তু হইলে হইবে কি—এক-কাঠা জমি ক্রয় করে, সে সঙ্গতি তাহার নাই। যৎকিঞ্চিৎ যাহা তাহার ধান্যের পুঁজি ছিল—কৃষিকার্য্যে অনবধানতা-গতিকে সে তাহা অনেকদিন হইল খোয়াইয়া বসিয়া আছে। এ অবস্থায় তাহার কর্ত্তব্য হ'চ্চে—প্রথমত জমিদারী সেরেস্তায় ঘুরিয়া-বেড়ানো বন্ধ করা। দ্বিতীয়ত কৃষিকার্য্যে উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়া ধান্যের সংস্থান করা। তৃতীয়ত ধান্যের মহাজনদিগকে আদর্শ করিয়া অল্প-স্বল্প বাণিজ্য-ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হওয়া! চতুর্থত যখন সে দেখিবে হাতে কিছু টাকা জমিয়াছে, তখন দুই-এক-বিঘা জমি ক্রয় করা! চাসাটির আদর্শ খুব উচ্চ—এটা ভাল বই মন্দ নহে; কিন্তু তা বলিয়া এটা ভুলিলে চলিবে না যে, নীচের নীচের ধাপ মাড়াইয়া আপনার শক্তি-সামর্থ্যকে সেই উচ্চ আদর্শের কাছ-বরাবর টানিয়া তুলিতে হইবে। এটা কেবল একটা উপমা-মাত্র। প্রকৃত কথা এই যে, জ্ঞানের সহিত শক্তি এবং সত্তার সামঞ্জস্য ব্যতিরেকে মনুষ্য-মনের অশান্তি এবং বিষাদ কিছুতেই ঘুচিবার নহে। জ্ঞান, শক্তি এবং সত্তা, তিনের সামঞ্জস্যই আনন্দের প্রস্রবণ। প্রথমে সত্তা এবং শক্তি হইতে জ্ঞানকে কতকমাত্রা বিশ্লেষিত করা আবশ্যক; কেন না, তাহা না করিলে সদসদ্বিবেক জন্মিতে পারে না। ফলেও এইরূপ দেখা যায় যে, পঠদ্দশায় বালক ব্যাকরণ এবং গণিত প্রভৃতি বিদ্যা যাহা শিক্ষা করে, তাহা নিছক জ্ঞানেরই ব্যাপার, তাহার সহিত কাজের কিংবা বাস্তবিক পদার্থের সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে কোনো সংস্রব নাই। ইহাতে—বালকের বুদ্ধি মার্জ্জিত হয়; কাহাকে বলে কর্ত্তা, কাহাকে বলে কর্ম্ম, কাহাকে বলে ক্রিয়া, কাহাকে বলে রেখা, কাহাকে বলে ফলক, কাহাকে বলে পিণ্ড, ইত্যাদি

বিষয়ে তাহার জ্ঞান জন্মে। প্রথমে জ্ঞানের এইরূপ বিশ্লেষণ আবশ্যক হয় বটে—কিন্তু চিরকালই যদি বালকের ব্যাকরণজ্ঞান শক্তি এবং সত্তা হইতে বিশ্লেষিত থাকে—বালক যদি যথাকালে ব্যাকরণে সুপণ্ডিত হইয়াও একছত্র চিঠি লিখিতে হইলে গলদ্‌-ঘর্ম্ম-কলেবর হয়, তবে তাহার সে জ্ঞান থাকা না থাকা সমান। পুঁথিগত জ্ঞানের সঙ্গে সত্তা এবং শক্তির যোগ হইলে, তবেই তাহা কাজের জ্ঞান হইয়া ওঠে। প্রথম-বয়সে সত্তা এবং শক্তি হইতে জ্ঞানকে বিশ্লেষিত করা যেমন আবশ্যক—উত্তর-বয়সে বিশ্লেষিত জ্ঞানকে সত্তা এবং শক্তির সহিত যোজনা করা তেমনিই আবশ্যক। কিন্তু একটি বিষয় সর্ব্বকালেই আবশ্যক; সে বিষয়টি হ'চ্চে—বিশ্লেষণ এবং সংযোজনের মধ্যে সামঞ্জস্যরক্ষা। প্রথম-বয়সেও জ্ঞানকে মাত্রাতীত বেশী বিশ্লেষিত করা বিধেয় নহে; আর, তাহা বিধেয় নহে বলিয়াই এক্ষণে পাশ্চাত্যপ্রদেশের অভিভাবক-মহলে কিণ্ডারগার্টেন-(kindergarten)-নামক নূতন শিক্ষাপ্রণালীর এতাধিক আন্দোলন চলিতেছে। তেমনি আবার দ্বিতীয়-বয়সেও জ্ঞানকে কার্য্যের সহিত অতিমাত্র বিমিশ্রিত করিয়া জ্ঞানের বিশুদ্ধি সমূলে নষ্ট করাও বিধেয় নহে; আর, তাহা বিধেয় নহে বলিয়াই, পাশ্চাত্য-পণ্ডিত-মহলে বৈশেষিক (specialist)-দিগের মাত্রাতীত দল-বৃদ্ধির প্রতিবিধানের জন্য সর্ব্বসমন্বয়ের (synthetic philosophy) একটা প্রকৃষ্টপথ আবিষ্কার করিবার চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। প্রকৃত কথা এই যে, শান্তি এবং আনন্দ লাভ করিতে হইলে, সত্তা, শক্তি এবং জ্ঞান—তিনের বিশ্লেষণ এবং সংযোজনের সামঞ্জস্য ব্যতিরেকে তাহা কোনোপ্রকারেই সম্ভাবনীয় নহে। এখন কথা হ'চ্চে এই যে, সামঞ্জস্য হয় কিসে? বিশ্লেষণই বা কতমাত্রা হইলে ঠিক্ হয়—সংযোজনই বা কতমাত্রা হইলে ঠিক্ হয়? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া এক হিসাবে অতীব সহজ, আর-এক হিসাবে অতীব কঠিন। তুমি যদি আমাকে জিজ্ঞাসা কর যে, মধ্যাহ্ন-ভোজনের সময় কি-পরিমাণ অন্ন ভক্ষণ এবং কি-পরিমাণ জল পান করিলে ঠিক হয়, তবে তাহার সহজ উত্তর এই যে, "তোমার ক্ষুধাতৃষ্ণা যেরূপ বলিবে—তুমি সেইরূপ করিবে"। কিন্তু সে কথায় সন্তুষ্ট না হইয়া তুমি যদি বলো "আমি প্রত্যহ কয়সের অন্ন ভক্ষণ করিব এবং কয়সের জল পান করিব, তাহার ঠিক্‌ঠাক্ পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিয়া দাও"—তবে সেটা বড়ই কঠিন সমস্যা।

ক্ষুধাতৃষ্ণা যেমন বলিয়া দ্যায়—এই-পরিমাণ অন্ন এবং এই পরিমাণ জল সেবনীয়, আনন্দ তেমনি বলিয়া দ্যায়—সত্তা-শক্তি-জ্ঞানের এই-পরিমাণ বিশ্লেষণ এবং এই-পরিমাণ সংযোজন প্রার্থনীয়। ফল কথা এই যে, সত্তা, শক্তি এবং জ্ঞান একীভূত হইয়া, মৃত সত্তায়, অথবা ফাঁকা জ্ঞানে, অথবা অন্ধ শক্তিতে পরিণত হইলেও আনন্দ হয় না, আর, পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যূথভ্রষ্ট মৃগের ন্যায় তিন দিকে তিন পথে প্রধাবিত হইলেও আনন্দ হয় না। সত্তা, শক্তি এবং জ্ঞানের যে-মাত্রা সংযোজন-বিশ্লেষণে আনন্দ হয়, তাহারই নাম সামঞ্জস্য।

সৌরজগতে আকর্ষণ এবং বিকর্ষণের সামঞ্জস্য কেমন চমৎকার! সূর্য্যের বন্ধনের টানে পড়িয়া সৌরজগৎ যদি সূর্য্যের সহিত একীভূত হইয়া যায়, তাহা হইলেও যেমন; আবার, সূর্য্যের নিকট হইতে তাড়া খাইয়া সৌরজগৎ যদি দড়ি ছিঁড়িয়া পলায়ন করে,

তাহা হইলেও তেমনি; দুয়েতেই সৌর-জগতের প্রলয়দশা উপস্থিত হয়। কত-মাত্রা-কাল সূর্য্যের অভিমুখী হইতে হইবে এবং কতমাত্রা কাল সূর্য্য হইতে পরাঙ্মুখী হইতে হইবে—পৃথিবীকে তাহা বলিয়া দিতে হয় না;—পৃথিবী তাহা ভালরূপ জানে;—পৃথিবীর তালবোধ আছে; তালবোধ থাকিবারই কথা—কেন না, সর্ব্বত্র নাট্যের কর্ত্রী ঐশী শক্তি নির্নিমিন্রনয়নে জাগিতেছেন।

এবারকার আলোচনাপথের মধ্য দিয়া আমরা ত্রিক হইতে চতুষ্কে উপনীত হইলাম। ত্রিক কি? না, সত্তা-শক্তি-জ্ঞান। চতুষ্ক কি? না, সত্তা-শক্তি-জ্ঞান-আনন্দ। আনন্দ হয় কিসে? সত্তা শক্তি এবং জ্ঞানের সামঞ্জস্যে। মাঝপথের কার্য্য এক-প্রকার হইয়া চুকিল—অতঃপর পোঁট্‌লা পুঁট্‌লি বাঁধিয়া সত্যরাজ্যের অভিমুখে প্রয়াণের উদ্যোগ করা যাইবে।

অর্ঘ্য।

প্রভু, যতদিন তুমি রাখিবে জগতে
তোমা পানে রব চাহি
চলে যাব বাহি জীবন তরণী
আনন্দ-গান গাহি।

মোর জনম মরণ সুখ সম্পদ
যত প্রেম ভালবাসা
যত দুখ যত সঙ্কট মোর
যতেক আশা নিরাশা,

আজি তব মঙ্গল ইচ্ছার মাঝে
হউক নীরবে লীন
আঁধার জীবনে তোমার আলোক
জ্বলে যেন নিশি দিন।

দেব, পদতলে তব পূজা যাহা দিব
বিফল হবে না জানি
তাইত করেছি অর্ঘ্য রচনা
আমার হৃদয় ছানি।

প্রভু, মিটাও মিটাও জনমের তৃষা
মিটাও প্রাণের ক্ষুধা
শ্রান্ত চিত্তে কর বরিষণ
তোমার শান্তিসুধা।

হে মোর পরাণ-প্রিয়
তোমার আশীষ চন্দন-রেখা
আমার ললাটে দিও।
পড়ি যদি পথে ঝঞ্জা আঘাতে
তুলে নিও তুমি মোরে নিজহাতে
তোমার করুণ কটাক্ষপাতে
পলাবে দুঃখনিশি।

যদি মোর মলিনতা
নাহি ঘুচে, তবে অশ্রু বহায়ে
দিও গো কঠিন ব্যথা!
শত সঙ্কটে তোমার অভয়
সদা যেন চিতে জাগ্রত রয়
তোমার কিরণে সব সংশয়
মুহূর্ত্তে যাবে মিশি।

সুন্দর প্রেমময়
তোমার প্রেমেতে পাষাণ হৃদয়ে
যেন সুধাধারা বয়।
পুষ্পের মত সুন্দর কর
আমার জীবন, সব তাপ হর
সৌরভে তার সুমধুরতর
হউক্ সকল দিশি।

নবীন ঊষার আলোকে হেরেছি
তোমার করুণ আস্য,
তারি সাথে ফোটা প্রভাতের ফুলে
মোহন্ মধুর হাস্য।

কাঞ্চন-রাগ রক্তিম থালে
সাজায়ে কুসুমরাশি

বন্দনা করে তরুণ তপন
...নিত্য প্রভাতে আসি।
আমি আজি মোর জীবনের ভার
লইয়ে আপন করে
যোড় করি হাত দাঁড়ানু সমুখে
বড়ই বেদনা ভরে।
হে শিব, শান্ত, শান্তি তোমাতে
কণাটুকু চাহি তার
আঘাত করিয়ে কর গো মুক্ত
রুদ্ধ হৃদয়-দ্বার।
যতদিন রব কর্ম্মের মাঝে
থেকো সাথে ওহে নাথ
অবসান কালে করিও প্রভু হে
করুণ নয়নপাত।

রাজনীতি-সংগ্রহ।

মহীপাল সর্ব্বোপায়ে সামান্য মিত্রকেও বশীভূত করিবেন। মিত্রবলেই শত্রুসকলকে সুখে উচ্ছেদ করা যায়। কারণ থাকিলে লোক শত্রু ও মিত্র দুইই হয়। যে কারণে শত্রু হয় তাহা পরিত্যাগ করিবে। এই শত্রু দ্বিবিধ—সহজ ও কার্য্যজ। স্বকুলজকে সহজ বলা যায়, আর অপরটী কার্য্যজ। উচ্ছেদ, অপচয়, পীড়ন ও কর্ষণ শত্রুর প্রতি এই চতুর্বিধ কার্য্য বিহিত হইয়া থাকে। সহজ শত্রু সর্ব্বাপহারী, সে ছিদ্র কর্ম্ম ও বিত্ত সমস্তই জানে। বহ্নি যেমন শুষ্ক বৃক্ষকে দগ্ধ করে সে স্বয়ং অন্তর্গত থাকিয়া সেইরূপেই সমস্ত দগ্ধ করিয়া থাকে। সর্ব্বোপায়ে তাহার উচ্ছেদ সাধন করিবে। নিজের উচ্ছেদ আশঙ্কা করিয়া তাহার অপচয়ে প্রবৃত্ত থাকিবে। কিন্তু যাহার উচ্ছেদে অন্য ব্যক্তি শত্রু হইয়া দাঁড়ায় কদাচ তাহার উচ্ছেদ করিবে না, প্রত্যুত তাহাকে আপনার আয়ত্ত করিবার চেষ্টা পাইবে। বংশাগত শত্রু উচ্ছিন্ন করিতে হইলে তাহারই এক জন বংশীয়ের অপেক্ষাকৃত উন্নতি সাধন আবশ্যক। কারণ, বিষ বিষ-দ্বারা, বজ্র বজ্র-দ্বারা, হস্তী দৃষ্টবল হস্তী-দ্বারা, মৎস্য মৎস্য-দ্বারা আর জ্ঞাতি জ্ঞাতি-দ্বারা নষ্ট হইয়া থাকে। রাম রাবণকে উচ্ছিন্ন করিবার জন্য বিভীষণকেই পূজা করিয়াছিলেন। যে কার্য্য করিলে মণ্ডল-সংক্ষোভ জন্মে বুদ্ধিমান সে কার্য্য কদাচ করিবে না। সাম দান ও মান দ্বারা আত্মীয় প্রকৃতিকে অনুরঞ্জিত করিবে আর ভেদ ও দণ্ড দ্বারা পরস্পরকে ছিন্ন ভিন্ন করিবে। শত্রু ও মিত্র দ্বারাই মণ্ডল সতত আকীর্ণ, সকলেই স্বার্থপর, মধ্যস্থতা অতি বিরল। যে মিত্র বিশেষ উপকার পাইয়াও বিকৃত হইয়া উঠে তাহাকেও নিপীড়িত করিবে। আর অত্যন্ত বিকৃত হইলে তাহার বিনাশ-সাধনই আবশ্যক, কারণ সেই পাপিষ্ঠ তখন শত্রু। শত্রুও যদি উপকারে আইসে তবে তাহাকে মিত্র করিয়া লইবে আর মিত্রও যদি অপকারপর হয় তাহাকে তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করিবে। হিতকার্য্যে যাহার অনুবন্ধন সেই বন্ধু, অনুরক্ত বা বিরক্তই হউক যে হিতকারী সেইই মিত্র। মিত্র দুষ্টদোষ হইলে তাহার পরিত্যাগই বিধেয়, আর নির্দ্দোষকে পরিত্যাগ করিলে ধর্ম্মার্থের হানি হইয়া থাকে। নৃপতি সর্ব্বদা নিজেই গুণদোষান্বেষী হইবেন, স্বয়ং গুণ দোষ জ্ঞাত হইলে বিচার ঠিক হয়। তিনি প্রকৃত-রূপ কিছু না বুঝিয়া রোষাবিষ্ট হইবেন না, যিনি নির্দ্দোষের প্রতি রোষ প্রকাশ করেন লোকে তাঁহাকে সর্পবৎ বুঝিয়া থাকে। কাহারও প্রতি মিথ্যা অভিযোগ করিবে না, প্রত্যুত স্থিরভাবে সমস্ত বিচার করিয়া দেখিবে, আর যাহারা কূট উপায়ে মিত্র ভেদ করিয়া দেয় তাহাদিগকে দূরে রাখিবে। বাক্য প্রাযোগিক, (ভেদাদির উপায়সম্ভূত) মাৎ-সরিকা মাধ্যস্থ, পাক্ষপাতিক, সোপন্যাস ও

সংশয়িত এই ছয় প্রকার হইয়া থাকে। স্থির ভাবে এই ষড়বিধ বাক্যের বিচারণায় প্রবৃত্ত থাকিবে। প্রকাশ্যে মিত্রের পক্ষ গ্রহণ স্বয়ং করিবেন না, ইহা দ্বারা পরস্পরের মনে মাৎসর্য্য সঞ্চারের কারণ একরূপ নিজেই হইতে হয়। কার্য্যের গুরুতা বুঝিয়া কালজ্ঞ রাজা নীচেরও বিদ্যমান দোষের প্রচ্ছাদন ও অবিদ্যমান গুণের প্রখ্যাপন করিবেন। সর্ব্বাবস্থায় সকলকেই মিত্র করিবার চেষ্টা পাওয়া আবশ্যক, যাঁহার মিত্রবাহুল্য তিনি শত্রুকে অনায়াসেই বশীভূত করিতে পারেন। পুরুষের আপদ প্রতীকারে সৎমিত্র যেখানে দাঁড়ান ভ্রাতাই বল পিতাই বল বা অন্যেই বল সেখানে আর কেহই সেরূপ দাঁড়ায় না। মিত্র উদাসীন ও শত্রু এতাবন্মাত্র এই মণ্ডল, ইহার যথাযথ সংশোধন মণ্ডলশোধন। যে নৃপতি নীতিপথে থাকিয়া এবং উদ্যমী হইয়া মণ্ডলশুদ্ধি করেন তিনি প্রজারঞ্জন পূর্ব্বক শারদীয় পূর্ণমণ্ডল চন্দ্রের ন্যায় বিরাজ করিয়া থাকেন।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭৪, কার্ত্তিক মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	২২৯।৵০
পূর্ব্বকার স্থিত	...	৫৫২ ৶৬
সমষ্টি	...	৭৮১॥/৬
ব্যয়	...	২৫৮ /৬
স্থিত	...	৫২৩॥০

আয়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত
আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন
একেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ
৫০০৲

সমাজের ক্যাশে মজুত ৫২৩॥০

৫২৩॥০

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	১৯০৲

মাসিক দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৮০৲

সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু নীলকমল মুখোপাধ্যায়
১০৲

১৯০৲

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	১২।৵০
পুস্তকালয়	...	৪৲
গচ্ছিত	...	/০
যন্ত্রালয়	...	২২॥০
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন		॥০
সমষ্টি		২২৯।৵০

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	১৪৮ ৩
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	২৪॥ ৬
পুস্তকালয়	...	৵০
যন্ত্রালয়	...	৮৫।৵৯
সমষ্টি		২৫৮ /৬

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ শিরোমণি। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
ধনরক্ষক। সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

চতুঃসপ্ততিতম সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ১১ মাঘ সোমবার প্রাতঃকাল ৮ ঘটিকার সময় আদি ব্রাহ্মসমাজগৃহে ব্রহ্মোপাসনা হইবে। অতএব ঐ দিবস যথা সময়ে উক্ত গৃহে সকলের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

Sermons of Maharshi Debendranath Tagore.

(Translated from Bengalee.)

SERMON XXXIX.

Perception of God In the Refreshing Influences of the Rainy Season.

Our souls experience the deepest satisfaction by worshipping the Supreme Father in this Temple of Divine worship at our weekly, monthly, and anniversary gatherings, in the company of the many God-devoted men who congregate here. Now the heat of the summer has vanished and at the advent of the rains every thing is enjoying the refreshing coolness of the season and we are regaled by a cool, fragrance-carrying breeze. Behold how the morning which is so exhilarating to us, has, under the influence of the rain which God has sent, assumed a fresh garb; how the leaves of trees have expanded themselves and unfolded a green colour that is delightful to the heart; how the birds perching on the boughs stir the leaves and give utterance to the joy in their breast at the top of their voice; how the frogs rejoicing at the abundance of the falling waters are gladdening the atmosphere by their cries of joy, so musical, issuing from their swollen throats; how the dusty roads washed by the rains look clean and bright; how all creatures gratified by the abundance of water, move about in glee; and how the peasants, observing the blue cornfields, so pleasing to the eyes, spreading out before them, are rejoicingly expecting a bumper crop. It seems that fountains of joy are now springing up here, there and everywhere: cool waters are drifted from all sides and besprinkled over us. As the rain falling in hundreds of jets cool our bodies, so in this hall the waters of immortal life fall in thousands of jets and cool our souls, Every day brings forth fresh manifestations of God's mercy, and of the aspects of His nature. As with every rise of the sun the earth renews its existence and makes a fresh start on the path of progress, so is our soul freshened and exalted with every diurnal revolution of the earth. In this progressive universe of God, simultaneous is the progress of the world and man, of matter and spirit. His mercy is clearly revealed everywhere, whether it be the world of matter or the world of spirit. Behold how the flowers in our heart that had folded have, with the rise of the sun, been unfolded by the Lord. Behold again how the breeze of His glory, laden with the tear drops of his loving worshippers, make those flowers tremble at one moment, and how at the next, as a matter of course, they are wafted to and scattered at His feet! To-day, in the midst of the refreshing coolness of the rainy season, we come nearer unto God, by realizing how cooling He is to our body and soul and to all that we see around us. Just at this moment God is calling us all to offer His nectar to us. Come, let us all prostrate ourselves at the feet of our Divine Mother and render ourselves immortal by drinking the nectar which is offered us by Her with Her own hands.

SERMON XL.

Loyalty to Brahmoism.

Brahmoism is a spiritual religion, it is the religion of the inner being ; the sanctification of the inner being is its positive effect. To purify and maintain in health our body we daily wash our mouth and face, go through ablutions and take regular exercise ; may we similarly wash away the foulness and impurity of our soul by the nectareous waters of God's holiness. But what must be the test of our gradual deliverance from the defilement of sin ? Brahmoism tells us what this test should be. Brahmoism says,

"যদা সর্ব্বে প্রভিদ্যন্তে হৃদয়স্যেহ গ্রন্থয়ঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যেতাবদনুশাসনং।"

"When in this life all the knots of the heart are unloosed, the individual instantly becomes immortal, that is, blessed with salvation; know this to be the only precept." But what are the knots of the heart ? They are nothing but our selfishness. If we can but renounce this selfishness, we can obtain perfect salvation. For when the knot of selfishness contracts our heart, thoughts of the Immortal Divinity can not enter it. Neither does the heart then receive any inspiration that may lead us to make God our aim and to perform the works He loveth. The more the knots of our heart loosen, the more the deep clouds of selfishness dwindle away, the more is the image of the All-good God clearly revealed to our vision and the greater is the onward progress we make towards obtaining Him. So we shall have to untie the knots of the heart to behold the face of God. Daily we must examine what progress we have made in slackening the heart-knots, how far we have expelled from us the propensity of selfishness and to what degree has the bright image of God been revealed to our spiritual vision. God is our end and aim ; He is all-holy and impervious to sin. If we endeavour to imitate and realize this supreme ideal, we may not be able to fully attain it, but we shall surely succeed, as the fruit of our endeavour, in making a certain advance towards God. However little the advancement we make through our feeble effort and God's grace, it must conduce to our good. Through eternity we shall ever advance on the path of progression and devolopment. Time which limits our life here is included in eternity, so in this life the more our knotted heart is freed from its knots and expanded, and the more our selfishness is enfeebled, the greater will be the progress that we shall make towards attaining salvation. But ennoble and expand however greatly we may our soul during our sublunary life, it will grow and develop through eternity— our knowledge will grow more and more bright, our will will become more and more free and strong, and we shall advance in holiness endlessly, for our ideal is God's infinite knowledge, will and goodness. But who is it that has held before us this ideal and through whose ministrations have we discerned this our supreme aim ? It is the holy religion of the Brahmo Samaj. In Bengal that is so bereft of strength and power is Brahmoism born : may we never neglect this religion. May we be able to render the whole continent of India worthy of the name of "BRAHMABARTA" or "The country encompassed by God," a name originally given by the Aryan inhabitants of ancient India to its northern portion. It is not enough to accept Brahmoism ; we must maintain and preserve it. It is much harder to maintain a boon than

to obtain it. At rare intervals we are so fortunate that God reveals Himself in our heart and fills it with abundant joy, but how hard it is to perpetuate the blissful exaltation of the soul we then experience! It may happen in the case of many of those who embrace Brahmoism that on the solemn occasion of their initiation when they are seated in the midst of a congregation of Brahmos, their heart is saturated with love of God, but it evaporates on the very next day. Whoever embraces Brahmoism should from the day of his initiation conduct himself in a way worthy of a beloved son of God, and dedicating to God all that he possesses, should become holy. Beware of using Brahmoism as a means for gaining honor or distinction. Brahmoism, this dear religion of ours, is only the means for attaining God, for acquiring the spiritual strength to trifle honor and distinction; it is the way to the attainment of the power to make a firm stand against all dangers, temporal and spiritual. Blessed is the life that sets after being spent, according to the dictates of Brahmoism, in the love of God and in the work He alone loveth. Such a life is filled with the surpassing glory of the sun. As at the approach of dawn the sun rises from the midst of darkness, piercing the sky, with a ruddy face full of enthusiasm, and awakens all creatures from slumber, and grows more and more bright with the growth of the day and joyfully does the work God hath appointed to it, and even when it sets, displays its beauty and glory in this sky and runs to another to accomplish its God-appointed duty there, so does a devout Brahmo who has dedicated his mind and life to God, rouses himself up, rends the intellectual and spiritual darkness that envelops the world, and awakens all men from the sleep of worldly infatuation, and when, after he has spent his whole life in the performance of works that God loveth, his senses grow feeble and the hour of his death arrives, he departs from the sky of this life, illumining with the bright light of his character the clouds of sadness that his departure raises, but rises in a new sky to perform God's work there with fresh enthusiasm. Ye Brahmos, imitate the example of the sun that is the store-house of light and dispels the darkness of the night. Hold God firm in your heart and do with all your will all work that He loves, and He-the Lord-will help you.

১৮২৫ শকের বৈশাখ হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সাহায্য ও মূল্য প্রাপ্তি স্বীকার।

নাম	স্থান	টাকা
শ্রীযুক্ত বাবু প্যারিমোহন রায়	কলিকাতা	১২৲
„ এল্ এন্ বেজবড়ুয়া এস্কোয়ার	হাওড়া	৩৲
„ এইচ্, সি, মল্লিক, এস্কোয়ার	কলিকাতা	৩।৵
„ সম্পাদক হরিসেবকাবওর্ণা,	„	১।৹
শ্রীযুক্ত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র রায় চৌধুরী,	দিনাজপুর	৬৸৹
„ „ নৃসিংহমুরারী পাঁজা	বর্দ্ধমান	৫৲
„ রাজা রণজিত সিংহ বাহাদুর	নাশিপুর	৬৸৹
„ সম্পাদক ব্রাহ্মসমাজ	কটক	৬।৵৹
„ বাবু বিহারীলাল রায় চৌধুরী	বরিশাল	৩।৵৹
„ এন্ হালদার এস্কোয়ার	কলিকাতা	৩৲
„ বাবু হেমলাল পাইন	„	৩৲
„ „ আশুতোষ চক্রবর্ত্তী	„	১৲
„ মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর	কাশিমবাজার	১২৸৵৹
„ বাবু প্রফুল্লচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	লাহোর	৩।৵৹
„ রায় বরদাকান্ত লাহিড়ী	পঞ্জাব	৩।৵৹
„ বাবু ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়	জুনিয়াদহ	১৸৶৹
„ „ বঙ্কুবিহারী পাল	কলিকাতা	১৲
„ „ যদুনাথ ঘোষ	„	৩৲
„ „ শ্রীশচন্দ্র মল্লিক	আন্দুল	২৲
„ „ কেদারনাথ রায়	কলিকাতা	৩৲
„ „ গৌরীশঙ্কর রায়	কটক	৩।৵৹
„ অবৈতনিক সম্পাদক শান্তিকুটীর লাইব্রেরী	বাগ্নী	।৵৹
„ বাবু পূর্ণচন্দ্র ঘোষ	কলিকাতা	৩৲
„ „ গিরীশচন্দ্র দত্ত	„	৩৲
„ „ চন্দ্রশেখর বসু	„	৩৲
„ „ বিহারীলাল মল্লিক	„	৩৲
„ রায় বলাইচাঁদ পাইন বাহাদুর	„	৩৲
„ বাবু রামচরণ মিত্র	„	৩৲
„ „ হরিমোহন দত্ত	„	৩৲
„ সম্পাদক ব্রাহ্মসমাজ	রামপুর হাট	।৵৹
শ্রীমতী রাণী হেমন্তকুমারী দেবী	পুঁটিয়া	৩।৵৹
শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ বসু	কলিকাতা	৩৲
„ „ যোগেন্দ্রলাল চৌধুরী	চট্টগ্রাম	৬৸৹
„ রায় শ্রীনাথ পাল বাহাদুর	কলিকাতা	৩৲
„ পণ্ডিত গিরীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন	„	৩৲
„ বাবু রজনীকান্ত বসু	কালাইন	৸৵৹
„ „ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়	কলিকাতা	৩৲
„ „ কালীপ্রসন্ন ঘোষ	„	৬৲
„ রাজা শ্রীনাথ রায় বাহাদুর	„	৩৲
„ বাবু মন্মথনাথ মিত্র	ভবানীপুর	৬৸৹
„ „ চন্দ্রকুমার দাস গুপ্ত	পাণ্ডুয়া	৩।৵৹
„ „ দেবেন্দ্রনাথ মিত্র	কলিকাতা	৩৲
„ „ প্রমথনাথ মল্লিক	„	৩৲
„ „ উমেশচন্দ্র দেব	„	৩৲
„ ডাক্তার দেবেন্দ্রনাথ রায়	„	৩৲
„ বাবু গোষ্ঠবিহারী চট্টোপাধ্যায়	„	৩৲
„ „ যাদবকৃষ্ণ দাস	„	৩৲
„ „ অঘোরনাথ শেঠ	„	৬৲
„ „ নিমাইচরণ মল্লিক	„	৩৲
„ „ প্রসাদদাস মল্লিক	„	৩৲
„ মৌলভি বিলাইত হোসেন সাহেব	„	৩৲
„ বাবু মাণিকলাল শীল	„	৩৲
„ „ মনোমোহন সিংহ রায়	জোড়হাটা	৩।৵৹
„ মহারাজা দুর্গাচরণ লাহা বাহাদুর	কলিকাতা	৩৲
„ বাবু দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	পাণ্ডুয়া	৩।৵৹
„ „ রামচন্দ্র সিং	কলিকাতা	৩৲
„ ডাক্তার ডি, এন্ চাটুর্জ্জি এস্কোয়ার	„	৩৲
„ বাবু শশীভূষণ ভট্টাচার্য্য	„	১৲
„ কবিরাজ সুরেন্দ্রনাথ কবিরত্ন	„	১৲
„ বাবু বনমালী চন্দ্র	„	৫৲
„ „ গোবিনলাল দাস	„	৩৲
„ „ কানাইলাল শেঠ	„	৩৲
শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	„	১২৲
শ্রীযুক্ত বাবু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	„	৩৲
„ „ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	„	৩৲
„ „ কানাইলাল সেন	ভবানীপুর	৪॥৹
„ „ অন্নদাপ্রসাদ সরকার	„	৩।৵৹
„ „ গণেশপ্রসাদ লালা	দারভাঙ্গা	৩।৵৹
„ „ নৃত্যগোপাল বসু	কলিকাতা	৩।৵৹
„ „ হরকুমার সরকার	রাজসাহী	৩॥৹
„ „ গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর	কলিকাতা	৩৲
„ সম্পাদক ব্রাহ্মসমাজ	কুচবিহার	৩৲
„ বাবু সতীশচন্দ্র মল্লিক	কলিকাতা	৩৲
„ „ কুলদাকিঙ্কর রায়	„	৩।৵৹
„ „ ললিতমোহন রায়	„	৩৲

ब्रह्मवा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम्
सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयसर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया
पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्यसाधनञ्च तदुपासनमेव।

চতুঃসপ্ততিতম সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

যথাসময়ে সভাগৃহ লোকে পূর্ণ হইলে সকলে সমস্বরে "দেহ জ্ঞান" এই বন্দনাগীত গান করিলেন। পরে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীশিবধন বিদ্যার্ণব ও শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়কে লইয়া বেদিগ্রহণ করিলে ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর বেদির সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া এইটী পাঠ করিলেন।

ভারতবাসীর প্রতি মহর্ষিদেবের কল্যাণ-বাণী।

অদ্যকার এই শুভ দিনে ভারতবাসী ব্যক্তি মাত্রকেই পূজ্যপাদ পিতৃদেবের একটি বলিবার কথা আছে। তাঁহার এখনকার শারীরিক অবস্থা এরূপ নহে যে তিনি তাঁহার অন্তর-নিহিত সেই কল্যাণ-বার্ত্তাটি স্বয়ং সাধারণের গোচর করিতে পারেন। এই জন্য আমি তাঁহার অনুজ্ঞাক্রমে তাঁহার প্রতিনিধি স্বরূপে তাহা আপনাদের নিকটে বহন করিতেছি। সর্ব্বমঙ্গলালয় বিশ্ববিধাতা পরমেশ্বরের আহ্বান শুনিয়া পূজ্যপাদ পিতৃদেব প্রথমে যখন জনসাধারণের সম্মুখে ব্রাহ্মধর্ম্ম লইয়া উপস্থিত হ'ন তখন তাঁহার অন্তরে ব্রহ্মসাধনের প্রকৃষ্ট পথ যাহা ঈশ্বর-প্রসাদে উদ্ভাসিত হইয়াছিল তাহার প্রকৃত বিবরণ এতদিন পর্য্যন্ত অপ্রকাশ ছিল, এক্ষণে তাঁহার আত্মজীবনী পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি বলিতেছেন, "আমি ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণের একটি প্রতিজ্ঞাপত্র রচনা করিয়াছিলাম তাহাতে প্রতিদিন গায়ত্রী মন্ত্র দ্বারা ব্রহ্মোপাসনা করিবার কথা ছিল। রামমোহন রায়ের গায়ত্রীর দ্বারা ব্রহ্মোপাসনা বিধান দেখিয়াই আমার মনে এইটি উদ্দীপিত হয়। সেই ব্রহ্মোপাসনা বিধানে আমি এই আশা পাইয়াছিলাম,—ওঁঙ্কার-পূর্ব্বিকাস্তিস্রো মহাব্যাহৃতয়োঽব্যয়াঃ। ত্রিপদাচৈব সাবিত্রী বিজ্ঞেয়ং ব্রহ্মণোমুখং॥ যোঽধীতেঽহন্যহন্যেতান্ ত্রীণি ব[illegible]তন্দ্রিতঃ স ব্রহ্ম পরমভ্যেতি" প্রণবপূর্ব্বক তিন মহাব্যাহৃতি অর্থাৎ ভূর্ভুবঃ স্বঃ আর ত্রিপাদ গায়ত্রী, এই তিন ব্রহ্মপ্রাপ্তির দ্বার হইয়াছেন। যে, তিন বৎসর, প্রতিদিন নিরালস্য হইয়া প্রণব ব্যাহৃতির সহিত গায়ত্রী মন্ত্র জপ করে, সে ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়। ঐ

প্রতিজ্ঞা পত্রে প্রাতে অভুক্ত অবস্থায় উপাসনা করিবার আর একটি কথা ছিল।”

* * * *

“আমি বুঝিলাম যে ব্রহ্মোপাসনার জন্য গায়ত্রী সাধারণের পক্ষে উপযুক্ত নহে, কিন্তু আমি সেই সাবিত্রীদেবীকেই ধরিয়া রহিলাম, কখনও পরিত্যাগ করিলাম না। পুরুষানুক্রমে আমরা এই গায়ত্রী মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া আসিতেছি। এই মন্ত্র আমাদের শিরায় শিরায়। যদিও উপনয়নের সময় আমি এই মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলাম কিন্তু তাহা আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম। যেই আমি রামমোহন রায়ের উদ্ধৃত গায়ত্রী দ্বারা ব্রহ্মোপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব দেখিলাম, অমনি তাহা আমার হৃদয়ে বিদ্ধ হইয়া গেল। আমি তাহার অর্থ আবৃত্তি করিয়া তাহারই জপেতে সাধ্যমত নিযুক্ত হইলাম। যখন আমি ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রতিজ্ঞা লিপিবদ্ধ করি, তখন তাহার মধ্যেও গায়ত্রী মন্ত্রের দ্বারা ব্রহ্মোপাসনা করিবার বিধান থাকে। গায়ত্রী মন্ত্র প্রচার করিয়া যদিও ইহার দ্বারা অন্যের উপকারে কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না, কিন্তু ইহাতে আমার সুফল ফলিল। আমি সম্যক্ রূপে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিপালনের জন্য প্রতিদিনই অভুক্ত অবস্থায় অতন্দ্রিত ও সংযত হইয়া গায়ত্রীর দ্বারা তাঁহার উপাসনা করিতে লাগিলাম। গায়ত্রীর গূঢ় ভাবার্থ আমার মনে দিন দিন আরো প্রকাশ হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে “ধিয়োযো নঃ প্রচোদয়াৎ” আমার সমস্ত হৃদয়ে মিশিয়া গেল। ইহাতে আমার দৃঢ় নিশ্চয় হইল যে, ঈশ্বর আমাকে কেবল যে মূক সাক্ষীর ন্যায় দেখিতেছেন, তাহা নহে। তিনি আমার অন্তরে থাকিয়া, অনুক্ষণ আমার বুদ্ধি-বৃত্তি-সকল প্রেরণ করিতেছেন। ইহাতে তাঁহার সহিত একটি ঘনিষ্ঠ জীবন্ত সম্বন্ধ নিবদ্ধ হইল। তাঁহাকে দূর হইতে প্রণাম করিয়াই পূর্ব্বে আপনাকে কৃতার্থ মনে করিয়াছিলাম, এখন সেই আশাতীত ফল প্রাপ্ত হইলাম যে, তিনি আমা হইতে দূরে নহেন, কেবল মূক সাক্ষী নহেন, কিন্তু তিনি আমার অন্তরে থাকিয়া ক্রমে ক্রমে আমার ভালচক্ষু জ্ঞানচক্ষু খুলিয়া দিলেন। * * গায়ত্রী মন্ত্র অবলম্বন করিয়া কি আশার অতীত ফলই পাইলাম। তাঁহার দর্শন পাইলাম, তাঁহার আদেশ শ্রবণ করিলাম, এবং একেবারে তাঁহার সঙ্গী হইয়া পড়িলাম। তিনি আমার হৃদয়ে আসীন হইয়া আমাকে চালাইতেছেন, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম। তিনি যেমন আকাশে থাকিয়া গ্রহ নক্ষত্রগণকে চালাইতেছেন, তেমনি, তিনি আমার হৃদয়ে থাকিয়া আমার ধর্ম্মবুদ্ধি প্রেরণ করিয়া আমার আত্মাকে চালাইতেছেন।”

গায়ত্রী সম্বন্ধে রামমোহন রায় যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

রামমোহনরায়ের প্রকাশিত ‘গায়ত্র্যা ব্রহ্মোপাসনা-বিধানং।’ (১)

গায়ত্রীর দ্বারা পরমোপাসনার বিধান।

অথাহ ভগবান্ মনুঃ। “ওঁঙ্কারপূর্ব্বিকাস্তিস্রোমহাব্যাহৃতয়োঽব্যয়াঃ। ত্রিপদা চৈব সাবিত্রী বিজ্ঞেয়ং ব্রহ্মণো মুখং ॥

যোঽধীতেঽহন্যহন্যেতান্ ত্রীণি বর্ষাণ্যতন্দ্রিতঃ। স ব্রহ্ম পরমভ্যেতি বায়ুভূতঃ খমূর্ত্তিমান্ ॥”

“ত্রিভ্যএব তু বেদেভ্যঃ পাদং পাদমদূদুহৎ। তদিত্যচোঽস্যাঃ সাবিত্র্যাঃ পরমেষ্ঠী প্রজাপতিঃ ॥” (২)

যোগিযাজ্ঞবল্ক্যশ্চ। “প্রণবব্যাহৃতিভ্যাঞ্চ গায়ত্র্যা ত্রিতয়েন চ। উপাস্যং পরমং ব্রহ্ম আত্মা যত্র প্রতিষ্ঠিতঃ ॥”

“ভূর্ভুবঃস্বস্তথা পূর্ব্বং স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা। ব্যাহৃতা জ্ঞানদেহেন তেন ব্যাহৃতয়ঃ স্মৃতাঃ ॥” (৩)

(২) ভগবান মনু এ প্রকরণে কহেন। “প্রণব পূর্ব্বক তিন মহাব্যাহৃতি অর্থাৎ ভূর্ভুবঃ আর ত্রিপাদ গায়ত্রী এই তিন ব্রহ্ম প্রাপ্তির দ্বার হইয়াছেন।

স পুনস্তদর্থং বিবৃণোতি শ্লোকৈস্ত্রিভিঃ।

"দেবস্য সবিতুর্যর্চ্চো ভর্গমন্তর্গতং বিভুং। ব্রহ্মবাদিন এবাহুর্বরেণ্যং চাস্য ধীমহি॥ চিন্তয়ামো বয়ং ভর্গং ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু বুদ্ধিবৃত্তীঃ পুনঃ পুনঃ॥ বুদ্ধেশ্চোদয়িতা যস্তু চিদাত্মা পুরুষো বিরাট্। বরেণ্যং বরণীয়ঞ্চ জন্মসংসারভীরুভিঃ"॥ (৪)

এবমন্তেঽপি গায়ত্র্যাঃ প্রণবজপো বিধীয়তে গুণবিষ্ণুধৃতস্মৃতিবচনেন॥ তদ্যথা।

"ব্রাহ্মণঃ প্রণবং কুর্য্যাদাদাবন্তে চ সর্ব্বদা। ক্ষরত্যনোংকৃতং পূর্ব্বং পরস্তাচ্চ বিশীর্য্যতি"॥ (৫)

মনুরপি স্মরতি তৎশ্রুত্যর্থং॥ "ক্ষরন্তি সর্ব্বা বৈদিক্যো জুহোতি যজতি ক্রিয়াঃ অক্ষরন্তক্ষরং জ্ঞেয়ং ব্রহ্ম চৈব প্রজাপতিঃ"।

যে ব্যক্তি প্রণব ও ব্যাহৃতি এবং গায়ত্রী এই তিনকে তিন বৎসর প্রতিদিন নিরালস্য হইয়া জপ করে সে ব্যক্তি পর ব্রহ্মে অভিনিবিষ্ট হয় এবং পবনতুল্য বিভূতি বিশিষ্ট হইয়া শরীর নাশের পর ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়।"

"তৎ সবিতুরিত্যাদি যে এই গায়ত্রী তাঁহার তিন পদকে তিন বেদ হইতে ব্রহ্মা উদ্ধার করিয়াছে।

(৩) যোগিযাজ্ঞবল্ক্য এস্থলে কহিতেছেন।

"প্রণব এবং ব্যাহৃতি ও গায়ত্রী এই তিনের প্রত্যেকের অথবা সমুদায়ের দ্বারা বুদ্ধিবৃত্তির আশ্রয় যে পরব্রহ্ম তাঁহার উপাসনা করিবেক।"

"যেহেতু পূর্ব্বকালে স্বয়ং ব্রহ্মা সমুদায় বিশ্ব যে ভূর্ভুবঃ স্বঃ তাঁহাকে ঈশ্বরের দেহরূপে ব্যাহৃত করিয়াছেন অর্থাৎ কহিয়াছেন সেই হেতু ঐ তিনকে ব্যাহৃতি শব্দে কহা যায় অতএব ঐ তিন শব্দ ত্রিলোকব্যাপক ঈশ্বরের প্রতিপাদক হন।"

(৪) সেই যোগি যাজ্ঞবল্ক্য তিন শ্লোকের দ্বারা গায়ত্রীর অর্থকে বিবরণ করিতেছেন (যাহা স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য ধৃত হয়) অর্থাৎ "সূর্য্যদেবের অন্তর্য্যামি সেই তেজঃস্বরূপ সর্ব্বব্যাপি সকলের প্রার্থনীয় পরমাত্মা যাঁহাকে ব্রহ্মবাদিরা কহেন সেই প্রার্থনীয়কে আমরা আমাদের অন্তর্য্যামিরূপে চিন্তা করি যিনি আমাদের বুদ্ধিকে ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষের প্রতি পুনঃ পুনঃ প্রেরণ করিতেছেন যিনি চিৎস্বরূপে বুদ্ধির প্রেরক হইয়া সম্পূর্ণ জগতে ব্যাপক হন আর যিনি জন্মমরণাদি সংসার হইতে যাঁহারা ভয়যুক্ত তাঁহাদের প্রার্থনীয় হন"।

(৫) গুণবিষ্ণুধৃত বচন দ্বারা যেমন গায়ত্রীর প্রথমে প্রণব জপ আবশ্যক হয় সেইরূপ শেষেও আবশ্যক হইয়াছে। সে এই বচন। "ব্রাহ্মণ গায়ত্রীর প্রতিবার জপেতে প্রথমে এবং অন্তেতে প্রণবোচ্চারণ করিবেন

আদ্যন্তোচ্চারিতস্য প্রণবস্য সাক্ষাদ্ব্রহ্মপ্রতিপাদকত্বং দর্শয়তি শ্রুতিঃ॥

মুণ্ডকোপনিষৎ॥ "ওঁমিত্যেবং ধ্যায়থ আত্মানং"। (৬)

"জপ্যেনৈব তু সংসিদ্ধ্যেৎ ব্রাহ্মণো নাত্র সংশয়ঃ। কুর্য্যাদন্যন্ন বা কুর্য্যান্মৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে"॥ (৭)

যোগিযাজ্ঞবল্ক্যশ্চ॥ "বাচ্যঃ স ঈশ্বরঃ প্রোক্তো বাচকঃ প্রণবঃ স্মৃতঃ। বাচকেপি চ বিজ্ঞাতে বাচ্য এব প্রসীদতি"। (৮)

ভগবদ্গীতায়াং॥ "ওঁ তৎ সদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ"। (৯)

গায়ত্র্যর্থোপসংহারে দর্শিতোনিষ্পন্নার্থঃ প্রাচীন ভট্টগুণবিষ্ণুনা॥

"যস্তথাভূতো ভর্গোঽস্মান্ প্রেরয়তি স জলজ্যোতীরসামৃত ভূরাদি লোকত্রয়াত্মক সকল চরাচর স্বরূপ ব্রহ্ম বিষ্ণু মহেশ্বর সূর্য্যাদি নানা দেবতাময় পরব্রহ্মস্বরূপো ভূরাদি সপ্ত লোকান্ প্রদীপবৎ প্রকাশয়ন্ মদায় জীবাত্মানং জ্যোতারূপং সত্যাখ্যং সপ্তমং ব্রহ্মলোকং ব্রহ্মস্থানং নাম্না আত্মন্যেব ব্রহ্মণি ব্রহ্মজ্যোতিষা সহৈকভাবং করোতু ইতি চিন্তয়ন্ জপং কুর্য্যাৎ"। (১০)

যেহেতু প্রথমে উচ্চারণ না করিলে ফলের চ্যুতি হয় এবং শেষে উচ্চারণ না করিলে ফলের ত্রুটি জন্মে"।

(৬) গায়ত্রীর আদ্য ও অন্তে উচ্চারিত হইয়াছেন যে প্রণব তাঁহার সাক্ষাৎ ব্রহ্মপ্রতিপাদকত্ব বেদে দর্শাইতেছেন।

মুণ্ডক শ্রুতি। ওঁকারের অবলম্বন করিয়া পরমাত্মার ধ্যান করহ।

(৭) ভগবান মনু সেই বেদার্থকে স্মরণ করিতেছেন। অর্থাৎ "বেদোক্ত ক্রিয়া কি হোম কি যাগ সকলই স্বভাবত এবং ফলত নাশকে পাইবেন কিন্তু জগতের পতি যে পরব্রহ্ম তাঁহার প্রতিপাদক ওঁকারের নাশ স্বভাবত কিম্বা ফলত কদাপি হয় না"।

"প্রণব গায়ত্রী জপের দ্বারা ব্রাহ্মণ পুরুষার্থ প্রাপ্ত হন অন্য কর্ম্ম করুন অথবা না করুন তিনি সকলের মিত্র হইয়া ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন বেদে কহিয়াছেন"।

(৮) যোগিযাজ্ঞবল্ক্য কহিতেছেন। "ওঁকারের প্রতিপাদ্য পরমেশ্বর এবং পরমেশ্বরের প্রতিপাদক ওঁকার হন অতএব পরব্রহ্মের প্রতিপাদক ওঁকারকে জানিলে প্রতিপাদ্য যে পরমাত্মা তেঁহ প্রসন্ন হন"।

(৯) ভগবদ্গীতা॥ "ওঁ তৎ সৎ এই তিন শব্দের দ্বারা পরব্রহ্মের কথন হয়"॥

(১০) গায়ত্রীর অর্থের উপসংহারে সমুদায়ের নিষ্পন্নার্থকে প্রাচীন বিবরণকার গুণবিষ্ণু লিখেন "যে

তথোক্তং গোড়ীয় স্মার্ত্তরঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যেন প্রণব ব্যাহৃতিভ্যাং ইত্যাদিবচন ব্যাখ্যা প্রকরণে "প্রণবাদি ত্রিতয়েন ব্রহ্মপ্রতিপাদকেনোচ্চারিতেন তদর্থাবগমেন চ উপাস্যং প্রসাদনীয়ং।" (১১)

এবং মহানির্ব্বাণপ্রদে তন্ত্রে চ। "তথা সর্ব্বেষু মন্ত্রেষু গায়ত্রী কথিতা পরা। জপেদিমাং মনঃপূতং মন্ত্রার্থমনু-চিন্তয়ন্॥ প্রণবব্যাহৃতিভ্যাঞ্চ গায়ত্রী পঠিতা যদি। সর্ব্বাসু ব্রহ্মবিদ্যাসু ভবেদাশু শুভপ্রদা॥ প্রাতঃ প্রদোষে রাত্রৌ বা জপেদ্ব্রহ্মমনা ভবন্। পূর্ব্বপাপ বিমুক্তোসৌ নাধর্ম্মে কুরুতে মনঃ॥ প্রণবং পূর্ব্বমুচ্চার্য্য ব্যাহৃতিত্রিতয়ন্তথা। ততস্ত্রিপাদ গায়ত্রীং প্রণবেন সমা-পয়েৎ॥ যস্মাৎ স্থিতিলয়োৎপত্তির্যেন ত্রিভুবনং ততং। সবিতুর্দৈবতস্যান্তর্যামি তদ্ভর্গমব্যয়ং॥ বরণীয়ং চিন্তয়ামঃ সর্ব্বান্তর্যামিনং বিভুং। যঃ প্রেরয়তি বুদ্ধিস্থো ধিয়োঽ-স্মাকং শরীরিণাং॥ এবমর্থযুতং মন্ত্রত্রয়ং নিত্যং জপন্নরঃ। বিনাঽন্যানিয়মায়াসৈঃ সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ॥ একমে-বাদ্বিতীয়ং যৎ সর্ব্বোপনিষদাং মতং। মন্ত্রত্রয়েণ নিষ্পন্নং তদক্ষরমগোচরং॥ একধা দশধা বা যঃ শতধা বা পঠেদিমান্। একাকী বহুভির্বাপি সংসিদ্ধোহুত্তরো-ত্তরং॥ জপান্তে সংস্মরেদ্ভূয় একমেবাদ্বয়ং বিভুং। তে-নৈব সর্ব্বকর্ম্মাণি সম্পন্নান্যকৃতান্যপি॥ অবধূতো গৃহ-স্থোবা ব্রাহ্মণোঽব্রাহ্মণোপি বা। তন্ত্রোক্তেষেষু মন্ত্রেষু সর্ব্বেষ্বয়রধিকারিণঃ॥ (১২)

এ প্রকার সর্ব্বব্যাপি ভর্গ আমাদের অন্তর্যামি হইয়া প্রেরণ করিতেছেন তেঁহ জল জ্যোতিঃ রস অমৃত এবং ভূরাদি লোকত্রয় এবং সকল চরাচরময় আর ব্রহ্ম বিষ্ণু মহেশ্বর সূর্য্যাদি নানা দেবতাময় হন সেই বিশ্বব্যাপি পরব্রহ্ম তেঁহ ভূঃ প্রভৃতি সপ্তলোককে প্রদীপের ন্যায় প্রকাশ করেন তেঁহ আমাদের জীবাত্মাকে জ্যোতির্ম্ময় সত্যাখ্য স্বরূপ আপনাতে আপন চিদ্রূপের সহিত এক-ভাব প্রাপ্ত করেন এইরূপ চিন্তা করিয়া গায়ত্রী জপ করিবেক"।

(১১) এতদ্দেশীয় সংগ্রহকার স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টা-চার্য্য গায়ত্রীর অর্থ প্রকরণে প্রণব ব্যাহৃতিভ্যাং ইত্যাদি বচনের ব্যাখ্যাতে লিখেন॥ "ব্রহ্মপ্রতিপাদক যে প্রণব ব্যাহৃতি গায়ত্রী তাঁহার উচ্চারণ ও তদর্থ জ্ঞান দ্বারা উপাসনা করিবেক"।

(১২) মহানির্ব্বাণ প্রদায়ি তন্ত্রে কহিতেছেন। "সেই মতে সকল মন্ত্রের মধ্যে গায়ত্রীকে শ্রেষ্ঠরূপে কহিয়াছেন 'মনের পবিত্রতা যে কালে হইবেক তখন মন্ত্রার্থ চিন্তা পূর্ব্বক তাঁহার জপ করিবেক॥ প্রণব ও ব্যাহৃতির সহিত গায়ত্রী যদি পঠিত হন তবে অন্য সকল ব্রহ্মবিদ্যা' অপেক্ষা করিয়া গায়ত্রী ঝটিতি শুভ প্রদান করেন॥ প্রাতে অথবা সন্ধ্যায় অথবা রাত্রি-কালে পরমেশ্বরে আবিষ্টচিত্ত হইয়া ইহার জপ করিলে সে ব্যক্তি পূর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হয় এবং পরে অধর্ম্ম কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় না॥ প্রথমে প্রণবের উচ্চারণ করিবেক পরে তিন ব্যাহৃতি তাহার পর গায়ত্রী পাঠ করিয়া শেষে প্রণবে সমাপ্তি করিবেক॥ যাঁহা হইতে স্থিতি ও লয় ও সৃষ্টি হয় যিনি ভুবনত্রয় ব্যাপিয়া রহেন সূর্য্যদেবের সেই অন্তর্যামি অতি প্রার্থ-নীয় অনির্বচনীয় জ্যোতীরূপ অব্যয় সর্ব্বান্তর্যামি বি-ভুকে আমরা চিন্তা করি যিনি আমাদের বুদ্ধিস্থ হইয়া আমাদের বুদ্ধি সকলকে প্রেরণ করিতেছেন॥ এই-রূপ অর্থযুক্ত তিন মন্ত্রকে নিত্য জপ করিলে অন্য নিয়ম ও আয়াস ব্যতিরেকে সর্ব্বসিদ্ধি প্রাপ্ত হয়॥ একমাত্র দ্বিতীয়রহিত যিনি সকল উপনিষদে কথিত হইয়াছেন সেই নিত্য মনোবুদ্ধি ইন্দ্রিয়ের অগোচর পূর্ব্বোক্ত এই তিন মন্ত্রের দ্বারা প্রতিপাদিত হইলেন॥ একবার অথবা দশবার অথবা শতবার যে ব্যক্তি একাকী অথবা অনেকের সহিত হইয়া এ সকলের জপ করে সে উত্তরোত্তর সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়॥ জপ সাঙ্গে পুনরায় সেই এক অদ্বিতীয় বিভুকে স্মরণ করিবেক ইহার দ্বারা তাবৎ বর্ণাশ্রম কর্ম্ম না করিলেও সে সকল সম্পন্ন হয়॥ অবধূত অথবা গৃহস্থ সেইরূপ ব্রাহ্মণ কিম্বা ব্রাহ্মণ ভিন্ন এই তন্ত্রোক্ত মন্ত্রে সকলে অধিকারী হন॥

তত্রাদৌ "ওঁ" ইতি জগতাং স্থিতিলয়োৎপত্ত্যেক-কারণং ব্রহ্ম নির্দ্দিশতি "যতোবা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্ম" ইতি শ্রুতিঃ।

তদোঙ্কারপ্রতিপাদ্যকারণং কিমেভ্যঃ কার্য্যেভ্যো বিভিন্নং তিষ্ঠতীত্যাশঙ্কায়ামনন্তরং পঠতি "ভূর্ভুবঃ স্বঃ" ইতি দ্বিতীয়মন্ত্রং। ইদং লোকত্রয়ং ব্যাপ্যৈব তৎ কারণরূপং ব্রহ্ম নিত্যমবতিষ্ঠতে "দিব্যোহ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ সবাহ্যাভ্যন্তরোহ্যজঃ ইতি শ্রুতিঃ।

কিং তর্হি তস্মাৎ কারণাৎ জগদন্তঃস্থিতানি স্থূলসূক্ষ্মা-ত্মকানি ভূতানি স্বাতন্ত্র্যেণ নিবহন্তি নবেতি সংশয়ে পুনঃপঠতি "তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো য়োনঃ প্রচোদয়াৎ" ইতি তৃতীয় মন্ত্রং। দীপ্তিমতঃ সূর্য্যস্য তদনির্ব্বচনীয়মন্তর্যামি জ্যোতীরূপং বিশেষেণ প্রার্থনীয়ং ন কেবলং সূর্য্যান্তর্যামী কিন্তু যোঽসৌ ভর্গঃ অস্মাকং সর্ব্বেষাং শরীরিণামন্তঃস্থো হন্তর্যামী সন্ বুদ্ধি-বৃত্তীর্বিষয়েষু প্রেরয়তি "য আদিত্যমন্তরো যময়তি এষ ত আত্মা অন্তর্যাম্যমৃতঃ" ইতি শ্রুতিঃ। "ঈশ্বরঃ সর্ব্ব-ভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি" ইতি গীতাস্মৃতিশ্চ।(১৩)

(১৩) তাহাতে আদৌ "ওঁ" এই শব্দ জগতের স্থিতি লয় উৎপত্তির কারণ পরব্রহ্মকে নির্দ্দেশ করিতে-ছেন। "যাঁহা হইতে এই সকল ভূত জন্মিতেছে আর জন্মিয়া যাঁহার দ্বারা স্থিতি করিতেছে ম্রিয়মাণ হইয়া যাঁহাতে পুনর্গমন করে তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা কর তেঁহ ব্রহ্ম হন" এই শ্রুতি।

সেই ওঙ্কারের প্রতিপাদ্য যে কারণ তিনি কি এই সকল কার্য্য হইতে বিভিন্নরূপে স্থিতি করেন এই আশ-ঙ্কায় পুনরায় পাঠ করিতেছেন "ভূর্ভুবঃ স্বঃ" এই তিন

ত্রয়াণাং মন্ত্রাণামভিধেয়স্যৈকত্বমেকত্বাদেকত্র জপো বিধীয়তে।

ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ।

তেষাময়ং সংক্ষেপার্থঃ।

সর্ব্বেষাং কারণং সর্ব্বত্রব্যাপিনং আসূর্য্যাদস্মদাদি সর্ব্বশরীরিণামন্তর্যামিনং চিন্তয়ামঃ ইতি। (১৪)

ব্যাপ্তিবাহা দ্বিতীয় মন্ত্র হয়। অর্থাৎ সেই কারণরূপ পরব্রহ্ম এই ত্রিলোক বিশ্বকে ব্যাপিয়া রহিয়াছেন। "জ্যোতীরূপ মূর্ত্তিরহিত অর্থাৎ স্বপ্রকাশ এবং সম্পূর্ণ ও অন্তর বাহ্যে ব্যাপিয়া বর্ত্তমান এবং জন্মরহিত পরমাত্মা হন" এই শ্রুতি।

জগতের অন্তঃপাতি স্থূল সূক্ষ্ম ভূত সকল সেই কারণ হইতে স্বতন্ত্র রূপে আপন আপন কার্য্য নির্ব্বাহ করেন কি না এই সংশয়ে পুনরায় পাঠ করিতেছেন "তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যোনঃ প্রচোদয়াৎ" এই তৃতীয় মন্ত্র অর্থাৎ দীপ্তিমন্ত সূর্য্যের সেই অনির্ব্বচনীয় অন্তর্যামী জ্যোতিঃ স্বরূপ বিশেষমতে প্রার্থনীয় তাঁহাকে আমরা চিন্তা করি তিনি কেবল সূর্য্যের অন্তর্যামি হন এমত নহে কিন্তু যে সেই স্বপ্রকাশ আমাদের সর্ব্বদেহীর অন্তঃস্থিত অন্তর্যামী হইয়া বুদ্ধিবৃত্তিকে বিষয়ে প্রেরণ করিতেছেন "যিনি সূর্য্যের অন্তবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে নিয়মে রাখিতেছেন সেই অবিনাশি তোমার অন্তর্যামী আত্মা হন অর্থাৎ তোমার অন্তঃস্থিত হইয়া তোমাকে নিয়মে রাখিতেছেন" এই শ্রুতি। ভগবদ্গীতা "সকল ভূতের হৃদয়ে হে অর্জ্জুন ঈশ্বর অবস্থিতি করেন"।

(১৪) এই তিন মন্ত্রের প্রতিপাদ্য এক পরব্রহ্ম হন এ কারণ তিনের একত্র জপের বিধি দিয়াছেন।

সেই তিনের সংক্ষেপার্থ এই।

সকলের কারণ সর্ব্বত্রব্যাপি সূর্য্য অবধি করিয়া আমাদের সকল দেহবন্তের অন্তর্যামি তাঁহাকে চিন্তা করি ইতি।

রামমোহন রায়ের প্রকাশিত "গায়ত্রীর অর্থ।"

বেদেতে এবং বেদান্তাদি দর্শনেতে ও মনু প্রভৃতি স্মৃতিতে এবং ভগবদ্গীতা ও তন্ত্রাদি শাস্ত্রেতে ব্রহ্মচারী গৃহস্থ বানপ্রস্থ সংন্যাসী তাবৎ আশ্রমীর প্রতি পরব্রহ্মোপাসনার ভূরি বিধিবাক্য আছে তাহার কিঞ্চিৎ লিখিতেছি। প্রথমত শ্রুতিঃ।

যতোবা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্‌ব্রহ্মেতি।

সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কারণ পরব্রহ্ম হয়েন তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা করহ।, বৃহদারণ্যকে ভগবান্ যাজ্ঞবল্ক্য আপন স্ত্রী মৈত্রেয়ীর প্রতি কহিতেছেন।

আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ।

শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন দ্বারা আত্মার সাক্ষাৎকার অর্থাৎ স্বরূপে অবস্থিতি করিবেক। আত্মানমেবোপাসীত। কেবল আত্মার উপাসনা করিবেক। মুণ্ডকোপনিষৎ।

তমেবৈকং জানথ আত্মানমন্যা বাচো বিমুঞ্চথ।

কেবল সেই এক আত্মাকে জানহ অন্য বাক্য ত্যাগ করহ।

ছান্দোগ্যে কুটম্বে শুচৌ দেশে স্বাধ্যায়মধীয়ানঃ ধার্ম্মিকান্ বিদধদাত্মনি সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি সংপ্রতিষ্ঠাপ্য আসন্ ইত্যাদি

বেদাধ্যয়নানন্তর গৃহাশ্রমে থাকিয়া পবিত্র স্থানে যথাবিধি অবস্থিতি করিয়া বেদপাঠ পূর্ব্বক পুত্র ও শিষ্যকে জ্ঞানোপদেশ এবং পরমাত্মাতে সকল ইন্দ্রিয়কে সংযোগ করিয়া দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিবেক। শ্বেতাশ্বতরশ্রুতিঃ।

তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।

কেবল আত্মাকে জানিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করে অর্থাৎ মুক্ত হয় আত্মজ্ঞান বিনা মোক্ষের আর উপায় নাই। মনুঃ।

যথোক্তান্যপি কর্ম্মাণি পরিহায় দ্বিজোত্তমঃ।

আত্মজ্ঞানে শমে চ স্যাৎ বেদাভ্যাসে চ যত্নবান্।

পূর্ব্বোক্ত কর্ম্ম সকলকে পরিত্যাগ করিয়াও ব্রাহ্মণ আত্মজ্ঞানে ইন্দ্রিয়নিগ্রহে প্রণবাদি বেদাভ্যাসে যত্ন করিবেক। যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

অনন্তবিষয়ং কৃত্বা মনোবুদ্ধিস্মৃতীন্দ্রিয়ং।

ধ্যেয় আত্মা স্থিতো যোঽসৌ হৃদয়ে দীপবৎ প্রভুঃ।

মন বুদ্ধি চিত্ত আর ইন্দ্রিয় সকলকে বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া হৃদয়ে অবস্থিত প্রকাশস্বরূপ যে পরমাত্মা তাঁহার চিন্তন করিবেক। ভগবদ্গীতা।

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।

হে অর্জ্জুন তুমি জ্ঞানিদের নিকটে প্রণাম করিয়া এবং তাঁহাদের নিকট প্রশ্ন ও সেবা করিয়া সেই আত্মতত্ত্বকে জান। কুলার্ণব।

করপাদোদরাস্যাদিরহিতং পরমেশ্বরি।

সর্ব্বতেজোময়ং ধ্যায়েৎ সচ্চিদানন্দবিগ্রহং।

হস্ত পাদ উদর মুখাদি রহিত সচ্চিদানন্দ স্বপ্রকাশ যে ব্রহ্মতত্ত্ব তাঁহার ধ্যান হে ভগবতি লোকে করিবেক। অতএব এপর্য্যন্ত বহুলা মতে বিধি বাক্য সকল বর্ত্তমান থাকাতে স্বার্থপর ব্যক্তি-সকলের এমৎ সাহস হঠাৎ হয় না যে এ সাধনকে অনাবশ্যক কিম্বা অকর্ত্তব্য কহেন কিন্তু আপন লাভার্থে অনুগত লোকদিগ্যে এ উপাসনা হইতে নিবর্ত্ত করিবার নিমিত্ত কহিয়া থাকেন যে এ

সাধন শাস্ত্রসিদ্ধ হইয়াও এদেশে পরম্পরাসিদ্ধ নহে। ওই অনুগত ব্যক্তিরা কি সিদ্ধপরম্পরা কি অন্ধপরম্পরা ইহার বিবেচনা না করিয়া আত্মোপাসনা হইতে বিমুখ হইয়া লৌকিক ক্রীড়া যাহাতে হঠাৎ মনোরঞ্জন হয় তাহাকেই পরমার্থ সাধন করিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন অতএব ব্রহ্মোপাসনা যেমন ব্রাহ্মণাদির প্রতি সর্ব্বশাস্ত্রে প্রাপ্ত হইয়াছে সেইরূপ পরম্পরাতেও সিদ্ধ হয় ইহা বিশেষ রূপে সকলকে জ্ঞাত করা এই এক প্রয়োজন হইয়াছে। প্রণব এবং ব্যাহৃতি ও ত্রিপাদ গায়ত্রী ইহাঁকে বাল্যকাল অবধি জপ করেন এবং অনেকে ইহার পুরশ্চরণো করিয়া থাকেন অথচ তাঁহাদের গায়ত্রীপ্রদাতা আচার্য্য অথচ পুরোহিত কিম্বা আত্মীয় পণ্ডিতেরা পরব্রহ্মোপাসনা হইতে তাঁহাদিগ্যে পরাঙ্মুখ রাখিবার নিমিত্ত এ মন্ত্রের কি অর্থ তাহা অনেককে কহেন না এবং ঐ জপকর্ত্তারাও ইহার কি অর্থ তাহা জানিবার অনুসন্ধান না করিয়া শুকাদির ন্যায় কেবল উচ্চারণ করিয়া এ মন্ত্রের যথার্থ ফল প্রাপ্তি হইতে বঞ্চিত হইতেছেন একারণ ইহার অর্থজ্ঞানের দ্বারা তাঁহাদের জপের সাফল্য হয় এই দ্বিতীয় প্রয়োজন হইয়াছে। অতএব প্রণব ও ব্যাহৃতি এবং গায়ত্রীর অর্থ যাহা বেদে এবং মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিতে লিখিয়াছেন তাহার বিবরণ করিতেছি এবং সংগ্রহকার ভট্টগুণবিষ্ণু ও স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাও সংক্ষেপে লিখিতেছি যাহার দ্বারা তাঁহাদের নিশ্চয় হইবেক যে প্রণব ও ব্যাহৃতি ও গায়ত্রী জপের দ্বারা পরব্রহ্মই জপকর্ত্তাদের অজ্ঞাতরূপে পরম্পরায় উপাস্য হয়েন তখন তাঁহাদের ব্রহ্মজিজ্ঞাসা হইলে পরমাত্মার শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনের দ্বারা কৃতার্থ হইতে পারিবেন। অর্থচিন্তার আবশ্যকতার প্রমাণ। স্মার্ত্তধৃত ব্যাসস্মৃতি।

> জপিত্বা প্রতিপদ্যেত গায়ত্রীং ব্রহ্মণা সহ।
> সোহমস্মীত্যুপাসীত বিধিনা যেন কেনচিৎ।

গায়ত্রীর অর্থ যে ব্রহ্ম হইয়াছেন সে অর্থের সহিত উচ্চারণ পূর্ব্বক এইরূপে তাঁহাকে জানিয়া যে গায়ত্রীর প্রতিপাদ্য যিনি ঈশ্বর তেঁহ মন বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা যে আত্মা তাঁহার সহিত অভিন্ন হয়েন উপাসনা করিবেক। আর গায়ত্রীর অর্থ প্রকরণে প্রণবব্যাহৃতিভ্যাং ইত্যাদি বচনের ব্যাখ্যাতে স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য লিখেন।

প্রণবাদিত্রিতয়েন ব্রহ্মপ্রতিপাদকেনোচ্চারিতেন তদর্থাবগমেন চ উপাস্যং প্রসাদনীয়ং।

ব্রহ্মপ্রতিপাদক যে প্রণব ব্যাহৃতি গায়ত্রী তাঁহার উচ্চারণ ও তদর্থ জ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মের উপাসনা করিবেক। এবং ভট্টগুণবিষ্ণুও গায়ত্রার অর্থের উপসংহারে লিখেন। যস্তথাভূতো ভর্গোঽস্মান্ প্রেরয়তি স জলজ্যোতী-রসামৃত-ভূরাদি-লোক-ত্রয়াত্মক-সকল-চরাচর-স্বরূপ-ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বর-সূর্য্যাদি-নানা-দেবতাময়-পরব্রহ্ম-স্বরূপো ভূরাদি সপ্তলোকান্ প্রদীপবৎপ্রকাশয়ন্ মদীয়জীবাত্মানং জ্যোতীরূপং সত্যাখ্যং সপ্তমং ব্রহ্মলোকং ব্রহ্মস্থানং নীত্বা আত্মন্যেব ব্রহ্মণি ব্রহ্মজ্যোতিষা সহৈকভাবং করোতীতি চিন্তয়ন্ জপং কুর্য্যাৎ। যে সর্ব্বব্যাপী ভর্গ আমাদের অন্তর্যামি হইয়া প্রেরণ করিতেছেন তেঁহ জল জ্যোতিঃ রস অমৃত এবং ভূরাদি লোকত্রয় হয়েন এবং সকল চরাচর স্বরূপ হয়েন আর ব্রহ্মাবিষ্ণু মহেশ্বর সূর্য্যাদি নানা দেবতা হয়েন তেঁহই বিশ্বময় পরব্রহ্ম তেঁহ ভূঃ প্রভৃতি সপ্তলোককে প্রদীপের ন্যায় প্রকাশ করেন তেঁহ আমাদের জীবাত্মাকে জ্যোতির্ম্ময় সত্যাখ্য সর্ব্বোপরি ব্রহ্মপদকে প্রাপ্ত করিয়া চিদ্রূপ পরব্রহ্ম স্বরূপ আপনাতে একত্ব প্রাপ্ত করেন এইরূপ চিন্তা করিয়া জপ করিবেক বিশেষত গায়ত্রীতে ধীমহি শব্দের দ্বারা জপাতিরিক্ত চিন্তা করিবার প্রতিজ্ঞা স্পষ্ট প্রাপ্ত হইতেছে অতএব গায়ত্রী জপকালে অর্থের জ্ঞান অবশ্য কর্ত্তব্য হয়। এবং যে তন্ত্রানুসারে এতদ্দেশে দীক্ষা করিয়া থাকেন তাহাতেও লিখেন যে মন্ত্রার্থ না জানিলে জপের বৈফল্য হয়। ইতি শকাব্দা ১৭৪০।

পূজ্যপাদ পিতৃদেবের এক্ষণে যে কথাটি বলিবার তাহা এইঃ—

“মনুষ্যের চরম লক্ষ্য এবং পরম গতি যে অণোরণীয়ান্ মহতোমহীয়ান্ একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম, দেশবিদেশে তাঁহার নামের ঘোষণা; এবং তাঁহাকে পাইবার যে সর্ব্বসাধারণ উপায়—তাঁহাতে প্রীতি এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন, জাতিনির্বিশেষে তাহার প্রচার ইহারই অনুষ্ঠান এযাবৎকাল পর্য্যন্ত হইয়া আসিতেছে। নিষ্কাম চিত্তে এবং ঈশ্বরার্পণ-বুদ্ধিতে যে কার্য্য যাঁহা কর্ত্তৃক করা হয়, তাহার ফলাফল-বিচারে আমাদের অধিকার নাই। যাঁহার কার্য্য করা হয় তাহাব ফলাফল তাঁহারই হস্তে। অর্দ্ধশতাব্দী অন্তে আজ ভারতবাসীদিগের নিকট ব্রহ্মসাধনের সেই যে একটি বিশেষ প্রণালী যাহা তাঁহাদের চিরকালের পৈতৃক সম্পত্তি তাহার প্রচারের সময় উপস্থিত। আমি সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত সকলকে আহ্বান করিতেছি যে, তাঁহারা গায়ত্রী অবলম্বন করিয়া বিশ্বজনের সন্তজনীয় পরমারাধ্য পরম দেবতা একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্মকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য যত্নশীল হউন। সকলের হৃদয়ে তিনি দেদীপ্যমানরূপে প্রকাশিত হউন্ এই আমার প্রার্থনা। কৃতজ্ঞচিত্তে আমি আমার

এই ক্ষীণ কণ্ঠে সর্ব্বমঙ্গলালয় পরমাত্মাকে ধন্যবাদ দিতেছি যে, তিনি এতদিন স্নেহময়ী জননীর ন্যায় আমার জীবন রক্ষা করিয়া আমাকে আমার অন্তরের এই নিগূঢ় কথাটি সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রকাশ করিবার অবকাশ দিয়াছেন। তিনিই ধন্য।

ওঁ শান্তিঃ।

পরে উপাসনাদি পরিসমাপ্ত হইলে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই উপদেশ দিলেন।

"উত্তিষ্ঠত! জাগ্রত!" উত্থান কর, জাগ্রত হও—এই বাণী উদ্‌ঘোষিত হইয়া গেছে। আমরা কে শুনিয়াছি কে শুনি নাই জানি না কিন্তু "উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত" এই বাক্য বার বার আমাদের দ্বারে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। সংসারের প্রত্যেক বাধা, প্রত্যেক দুঃখ, প্রত্যেক বিচ্ছেদ কত শতবার আমাদের অন্তরাত্মার তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে আঘাত দিয়া যে ঝঙ্কার দিয়াছে তাহাতে কেবল এই বাণী ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, —উত্থান কর, জাগ্রত হও! অশ্রুশিশির-ধৌত আমাদের নব জাগরণের জন্য নিখিল অনিমেষনেত্রে প্রতীক্ষা করিয়া আছে—কবে সেই প্রভাত আসিবে, কবে সেই রাত্রির অন্ধকার অপগত হইয়া আমাদের অপূর্ব্ব বিকাশকে নির্ম্মল নবোদিত অরুণালোকে উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিবে! কবে আমাদের বহুদিনের বেদনা সফল হইবে, আমাদের অশ্রুধারা সার্থক হইবে!

পুষ্পকে আজ প্রাতঃকালে বলিতে হয় নাই যে, রজনী প্রভাত হইল—তুমি আজ প্রস্ফুটিত হইয়া ওঠ। বনে বনে আজ বিচিত্র পুষ্পগুলি অতি অনায়াসেই বিশ্বজগতের অন্তর্গূঢ় আনন্দকে বর্ণে গন্ধে-শোভায় বিকশিত করিয়া মাধুর্য্যের দ্বারা নিখিলের সহিত কমনীয় ভাবে আপনার সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছে। পুষ্প আপনাকেও পীড়ন করে নাই, অন্য কাহাকেও আঘাত করে নাই, কোন অবস্থায় দ্বিধার লক্ষণ দেখায় নাই, সহজ সার্থকতায় আদ্যোপান্ত প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে।

ইহা দেখিয়া মনের মধ্যে এই আক্ষেপ জন্মে যে আমার জীবন কেন বিশ্বব্যাপী আনন্দ-কিরণপাতে এমনি সহজে এমনি সম্পূর্ণভাবে বিকশিত হইয়া উঠে না? সে তাহার সমস্ত দলগুলি সঙ্কুচিত করিয়া আপনার মধ্যে এত প্রাণপণে কি আঁকড়িয়া রাখিতেছে? প্রভাতে তরুণ সূর্য্য আসিয়া অরুণকরে তাহার দ্বারে আঘাত করিতেছে, বলিতেছে আমি যেমন করিয়া আমার চম্পককিরণরাজি সমস্ত আকাশময় মেলিয়া দিয়াছি তুমি তেমনি সহজে আনন্দে বিশ্বের মাঝখানে আপনাকে অবাধিত করিয়া দেও! রজনী নিঃশব্দপদে আসিয়া স্নিগ্ধহস্তে তাহাকে স্পর্শ করিয়া বলিতেছে, আমি যেমন করিয়া আমার অতলস্পর্শ অন্ধকারের মধ্য হইতে আমার সমস্ত জ্যোতিঃসম্পদ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছি তুমি তেমন করিয়া একবার অন্তরের গভীর তলের দ্বার নিঃশব্দে উদ্‌ঘাটন করিয়া দাও—আত্মার প্রচ্ছন্ন রাজভাণ্ডার একমুহূর্ত্তে বিস্মিত বিশ্বের সম্মুখীন কর। নিখিল জগৎ প্রতিক্ষণেই তাহার বিচিত্র স্পর্শের দ্বারা আমাদিগকে এই কথাই বলিতেছে, আপনাকে বিকশিত কর, আপনাকে সমর্পণ কর, আপনার দিক্ হইতে একবার সকলের দিকে ফের, এই জল-স্থল-আকাশে এই সুখদুঃখের বিচিত্র সংসারে অনির্ব্বচনীয় ব্রহ্মের প্রতি আপনাকে একবার সম্পূর্ণ উন্মুখ করিয়া ধর।

কিন্তু বাধার অন্ত নাই—প্রভাতের

ফুলের মত করিয়া এমন সহজে এমন পরিপূর্ণভাবে আত্মোৎসর্গ করিতে পারি না। আপনাকে আপনার মধ্যেই আবৃত করিয়া রাখি, চারিদিকে নিখিলের আনন্দ-অভ্যুদয় ব্যর্থ হইতে থাকে।

কে বলিবে ব্যর্থ হইতে থাকে? প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যে অনন্ত জীবন রহিয়াছে তাহার সফলতার পরিমাণ কে করিতে পারে? পুষ্পের মত আমাদের ক্ষণকালীন সম্পূর্তি নহে। নদী যেমন তাহার বহুদীর্ঘ তটদ্বয়ের ধারাবাহিক বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া, কত কত পর্ব্বত-প্রান্তর-মরু-কানন-নগর-গ্রামকে তরঙ্গাভিহত করিয়া আপনার সুদীর্ঘ যাত্রার বিপুল সঞ্চয়কে প্রতিমুহূর্ত্তে নিঃশেষে মহাসমুদ্রের নিকট উৎসর্গ করিতে থাকে, কোনো কালে তাহার অন্ত থাকে না,—তাহার অবিশ্রাম প্রবাহধারারও অন্ত থাকে না—তাহার চরম বিরামেরও সীমা থাকে না—মনুষ্যত্বকে সেইরূপ বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়া বিপুল ভাবে মহৎ সার্থকতা লাভ করিতে হয়। তাহার সফলতা সহজ নহে। নদীর ন্যায় প্রতিপদে সে নিজের পথ নিজের বলে নিজের বেগে রচনা করিয়া চলে। কোনো কূল গড়িয়া, কোনো কূল ভাঙিয়া, কোথাও বিভক্ত হইয়া, কোথাও সংযুক্ত হইয়া, নব নব বাধা দ্বারা আবর্ত্তবেগে ঘূর্ণিত হইয়া সে আপনাকে আপনি বৃহৎ করিয়া সৃষ্টি করিতে থাকে; অবশেষে যখন সে আপনার সীমাবিহীন পরিণামে আসিয়া উপস্থিত হয় তখন সে বিচিত্রকে অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে বলিয়াই মহান্ একের সহিত তাহার মিলন সম্পূর্ণ হয়। বাধা যদি না থাকিত তবে সে বৃহৎ হইতে পারিত না—বৃহৎ না হইলে বিরাটের মধ্যে তাহার বিকাশ পরিপূর্ণ হইত না।

দুঃখ আছে—সংসারের দুঃখের শেষ নাই। সেই দুঃখের আঘাতে সেই দুঃখের বেগে সংসারে প্রকাণ্ড ভাঙন গড়ন চলিতেছে—ইহাতে অহরহ যে তরঙ্গ উঠিতেছে তাহার কতই ধ্বনি, কতই বর্ণ, কতই গতিভঙ্গিমা। মানুষ যদি ক্ষুদ্র হইত, এবং ক্ষুদ্রতাতেই মানুষের যদি শেষ হইত তবে দুঃখের মত অসঙ্গত কিছুই হইতে পারিত না। এত দুঃখ ক্ষুদ্রের নহে। মহতেরই গৌরব দুঃখ। বিশ্বসংসারের মধ্যে মনুষ্যত্বই সেই দুঃখের মহিমায় মহীয়ান্—অশ্রুজলেই তাহার রাজ্যাভিষেক হইয়াছে। পুষ্পের দুঃখ নাই, পশুপক্ষীর দুঃখ-সীমা সঙ্কীর্ণ—মানুষের দুঃখ বিচিত্র, তাহা গভীর, অনেক সময়ে তাহা অনির্ব্বচনীয়—এই সংসারের মধ্যে তাহার বেদনার সীমা যেন সম্পূর্ণ করিয়া পাওয়া যায় না।

এই দুঃখই মানুষকে বৃহৎ করে, মানুষকে আপন বৃহত্ত্ব সম্বন্ধে জাগ্রত-সচেতন করিয়া তোলে, এবং এই বৃহত্ত্বেই মানুষকে আনন্দের অধিকারী করিয়া তোলে। কারণ, ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি। অল্পে আমাদের আনন্দ নাই, যাহাতে আমাদের খর্ব্বতা, আমাদের স্বল্পতা তাহা অনেক সময়ে আমাদের আরামের হইতে পারে কিন্তু তাহা আমাদের আনন্দের নহে। যাহা আমরা বীর্য্যের দ্বারা না পাই, অশ্রুর দ্বারা না পাই, যাহা অনায়াসের—তাহা আমরা সম্পূর্ণ পাই না—যাহাকে দুঃখের মধ্য দিয়া কঠিন ভাবে লাভ করি হৃদয় তাহাকেই নিবিড় ভাবে সমগ্র ভাবে প্রাপ্ত হয়। মনুষ্যত্ব আমাদের পরম দুঃখের ধন, তাহা বীর্য্যের দ্বারাই লভ্য। প্রত্যহ পদে পদে বাধা অতিক্রম করিয়া যদি তাহাকে পাইতে না হইত, তবে তাহাকে পাইয়াও পাইতাম না—যদি তাহা সুলভ হইত, তবে আমাদের হৃদয় তাহাকে সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ করিত

না। কিন্তু তাহা দুখের দ্বারা দুর্লভ, তাহা মৃত্যুশঙ্কার দ্বারা দুর্লভ, তাহা ভয়-বিপদের দুর্লভ, তাহা নানাভিমুখী প্রবৃত্তির সংক্ষোভের দ্বারা দুর্লভ। এই দুর্লভ মনুষ্যত্বকে অর্জ্জন করিবার চেষ্টায় আত্মা আপনার সমস্ত শক্তি অনুভব করিতে থাকে। সেই অনুভূতিতেই তাহার প্রকৃত আনন্দ। ইহাতেই তাহার যথার্থ আত্মপরিচয়। ইহাতেই সে জানিতে পায় দুঃখের ঊর্দ্ধে তাহার মস্তক, মৃত্যুর ঊর্দ্ধে তাহার প্রতিষ্ঠা। এইরূপে সংসারের বিচিত্র অভিঘাতে দুঃখবাধার সহিত নিরন্তর সংগ্রামে যে আত্মার সমস্ত শক্তি জাগ্রত, সমস্ত তেজ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে সেই আত্মাই ব্রহ্মকে যথার্থভাবে লাভ করিবার উদ্যম প্রাপ্ত হয়—ক্ষুদ্র আরামের মধ্যে, ভোগ বিলাসের মধ্যে যে আত্মা জড়ত্বে আবিষ্ট হইয়া আছে, ব্রহ্মের আনন্দ তাহার নহে। সেই জন্য উপনিষদ বলিয়াছেন—"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"—এই আত্মা (জীবাত্মাই বল পরমাত্মাই বল) ইনি বলহীনের দ্বারা লভ্য নহেন। সমগ্র শক্তিকে সম্পূর্ণভাবে প্রয়োগ করিবার যত উপলক্ষ্য ঘটে ততই আত্মাকে প্রকৃত ভাবে লাভ করিবার উপায় হয়।

এই জন্যই পুষ্পের পক্ষে পুষ্পত্ব যত সহজ মানুষের পক্ষে মনুষ্যত্ব তত সহজ নহে। মনুষ্যত্বের মধ্য দিয়া মানুষকে যাহা পাইতে হইবে তাহা নিদ্রিত অবস্থায় পাইবার নহে। এই জন্যই সংসারের সমস্ত কঠিন আঘাত আমাদিগকে এই কথা বলিতেছে—"উত্তিষ্ঠত! জাগ্রত!। প্রাপ্য বরান্ নিবোধত! ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি!"—"উঠ, জাগ! যথার্থ গুরুকে প্রাপ্ত হইয়া বোধ লাভ কর। সেই পথ শাণিত ক্ষুরধারের ন্যায় দুর্গম, কবিরা এইরূপ বলেন।

অতএব প্রভাতে যখন বনে উপবনে পুষ্প পল্লবের মধ্যে তাহাদের ক্ষুদ্র সম্পূর্ণতা তাহাদের সহজ শোভা পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে, তখন মানুষ আপন দুর্গম পথ, আপন দুঃসহ দুঃখ, আপন বৃহৎ অসমাপ্তির গৌরবে মহত্তর, বিচিত্রতর আনন্দের গীত কি গাহিবে না? যে প্রভাতে তরুলতার মধ্যে কেবল পুষ্পের বিকাশ এবং পল্লবের হিল্লোল, পাখীর গান এবং ছায়ালোকের স্পন্দন, সেই শিশিরধৌত জ্যোতির্ম্ময় প্রভাতে মানুষের সম্মুখে সংসার—তাহার সংগ্রামক্ষেত্র—সেই রমণীয় প্রভাতে মানুষকেই বদ্ধপরিকর হইয়া তাহার প্রতিদিনের দুরূহ জয়চেষ্টার পথে ধাবিত হইতে হইবে, ক্লেশকে বরণ করিয়া লইতে হইবে, সুখ দুঃখের উত্তাল তরঙ্গের উপর দিয়া তাহাকে তরণী বাহিতে হইবে—কারণ, মানুষ মহৎ, কারণ, মনুষ্যত্ব সুকঠিন, এবং মানুষের যে পথ দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।

কিন্তু সংসারের মধ্যেই যদি সংসারের শেষ দেখি তবে দুঃখ কষ্টের পরিমাণ অত্যন্ত উৎকট হইয়া উঠে—তাহার সামঞ্জস্য থাকে না। তবে এই বিষম ভার কে বহন করিবে? কেনই বা বহন করিবে? কিন্তু যেমন নদীর এক প্রান্তে পরম বিরাম সমুদ্র, অন্যদিকে সুদীর্ঘ তটনিরুদ্ধ অবিরাম-যুদ্ধমান জলধারা তেমনি আমাদেরও যদি একই সময়ে এক দিকে ব্রহ্মের মধ্যে বিশ্রাম ও অন্যদিকে সংসারের মধ্যে অবিশ্রাম গতিবেগ না থাকে তবে এই গতির কোনই তাৎপর্য্য থাকে না, আমাদের প্রাণপণ চেষ্টা অদ্ভুত উন্মত্ততা হইয়া দাঁড়ায়। ব্রহ্মের মধ্যেই আমাদের সংসারের পরিণাম, আমাদের কর্ম্মের গতি। শাস্ত্র বলিয়াছেন—ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ "যদ্ যদ্ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্ ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ" যে যে কর্ম্ম করিবেন তাহা ব্রহ্মে

সমর্পণ্‌ করিবেন—ইহাতে একই কালে কর্ম্ম এবং বিরাম, চেষ্টা এবং শান্তি, দুঃখ এবং আনন্দ। ইহাতে একদিকে আমাদের আত্মার কর্তৃত্ব থাকে ও অন্যদিকে যেখানে সেই কর্তৃত্বের নিঃশেষে বিলয়, সেইখানে সেই কর্তৃত্বকে প্রতিক্ষণে বিসর্জ্জন দিয়া আমরা প্রেমের আনন্দ লাভ করি।

প্রেম ত কিছু না দিয়া বাঁচিতে পারে না। আমাদের কর্ম্ম, আমাদের কর্তৃত্ব যদি একেবারেই আমাদের না হইত তবে ব্রহ্মের মধ্যে বিসর্জ্জন দিতাম কি? তবে ভক্তি তাহার সার্থকতা লাভ করিত কেমন করিয়া? সংসারেই আমাদের কর্ম্ম, আমাদের কর্তৃত্ব—তাহাই আমাদের দিবার জিনিস। আমাদের প্রেমের চরম সার্থকতা হইবে, যখন আমাদের সমস্ত কর্ম্ম, সমস্ত কর্তৃত্ব আনন্দে ব্রহ্মকে সমর্পণ করিতে পারিব। নতুবা কর্ম্ম আমাদের পক্ষে নিরর্থক ভার ও কর্তৃত্ব বস্তুত সংসারের দাসত্ব হইয়া উঠিবে। পতিব্রতা স্ত্রীর পক্ষে তাহার পতিগৃহের কর্ম্মই গৌরবের, তাহা আনন্দের—সে কর্ম্ম তাহার বন্ধন নহে, পতিপ্রেমের মধ্যেই তাহা প্রতিক্ষণেই মুক্তি লাভ করিতেছে—এক পতিপ্রেমের মধ্যেই তাহার বিচিত্র কর্ম্মের অখণ্ড ঐক্য, তাহার নানা দুঃখের এক আনন্দ-অবসান—ব্রহ্মের সংসারে আমরা যখন ব্রহ্মের কর্ম্ম করিব, সকল কর্ম্ম ব্রহ্মকে দিব, তখন সেই কর্ম্ম এবং মুক্তি একই কথা হইয়া দাঁড়াইবে, তখন এক ব্রহ্মে আমাদের সমস্ত কর্ম্মের বৈচিত্র্য বিলীন হইবে, সমস্ত দুঃখের ঝঙ্কার একটি আনন্দ-সঙ্গীতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে।

প্রেম যাহা দান করে সেই দান যতই কঠিন হয় ততই তাহার সার্থকতার আনন্দ নিবিড় হয়। সন্তানের প্রতি জননীর স্নেহ দুঃখের দ্বারাই সম্পূর্ণ—প্রীতিমাত্রই কষ্ট দ্বারা আপনাকে সমগ্রভাবে সপ্রমাণ করিয়া কৃতার্থ হয়। ব্রহ্মের প্রতি যখন আমাদের প্রীতি জাগ্রত হইবে তখন আমাদের সংসারধর্ম্ম দুঃখ ক্লেশের দ্বারাই সার্থক হইবে, তাহা আমাদের প্রেমকেই প্রতিদিন উজ্জ্বল করিবে! অলঙ্কৃত করিবে;—ব্রহ্মের প্রতি আমাদের আত্মোৎসর্গকে দুঃখের মূল্যেই মূল্যবান্‌ করিয়া তুলিবে।

হে প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন, আমার দৃষ্টি, শ্রবণ, চিন্তা, আমার সমস্ত কর্ম্ম, তোমার অভিমুখেই অহরহ চলিতেছে, ইহা আমি জানি না বলিয়াই, দুঃখ পাই। আমি সমস্তকেই অন্ধভাবে বলপূর্ব্বক আমার বলিতে চাই—বল রক্ষা হয় না—আমার কিছুই থাকে না। নিখিলের দিক হইতে, তোমার দিক হইতে সমস্ত নিজের দিকে টানিয়া-টানিয়া রাখিবার নিষ্ফল চেষ্টায় প্রতিদিন পীড়িত হইতে থাকি। আজ আমি আর কিছুই চাহি না, আমি আজ পাইবার প্রার্থনা করিব না, আজ আমি দিতে চাই, দিবার শক্তি চাই। তোমার কাছে আমি আপনাকে পরিপূর্ণরূপে রিক্ত করিব, রিক্ত করিয়া পরিপূর্ণ করিব। তোমার সংসারে কর্ম্মের দ্বারা তোমার যে সেবা করিব, তাহা নিরন্তর হইয়া আমার প্রেমকে জাগ্রত নিষ্ঠাবান করিয়া রাখুক, তোমার অমৃত-সমুদ্রের মধ্যে অতলস্পর্শ যে বিশ্রাম, তাহাও আমাকে অবসানহীন শান্তি দান করুক। তুমি দিনে দিনে স্তরে স্তরে আমাকে শতদল পদ্মের ন্যায় বিশ্বজগতের মধ্যে বিকশিত করিয়া তোমারই পূজার অর্ঘ্যরূপে গ্রহণ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্‌।

পরে সঙ্গীতাদি হইয়া সভাভঙ্গ হইল।

রাত্রিকালে মহর্ষিদেবের গৃহপ্রাঙ্গণ লোকপূর্ণ হইলে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীশিবধন বিদ্যার্ণবকে লইয়া বেদিগ্রহণ করিলে শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এইটী পাঠ করিলেন।

অদ্য এই মাঘের পুণ্য একাদশ দিবসে আমরা পরম দেবতা পরমাত্মার বাৎসরিক পূজায় ব্রহ্মানন্দরস পান করিয়া আত্মার ক্ষোভ মিটাইবার জন্য এখানে সবান্ধবে সমাগত হইয়াছি। সুসময়ে ক্ষণকালের জন্য দেবতার বর্ষণ হইলে কতকাল ধরিয়া এবং কত দেশ ব্যাপিয়া লোকে অন্ন ভোজন করিয়া সুখী হয় তাহা আমাদের সকলেরই জানা আছে। অদ্যকার এই শুভ মুহূর্ত্তে তাই আমরা প্রীতি-ভক্তির কুসুমাঞ্জলি হৃদয়ে করিয়া পরম করুণাময় পরমাত্মার প্রসাদামৃত বর্ষণের প্রতি উন্মুখ হইয়া রহিয়াছি। পরমাত্মা আমাদের চিরারাধ্য পরমদেবতা; তিনি আমাদের কল্যাণদাতা পিতামাতা, আশ্রয়দাতা প্রভু, জ্ঞানদাতা গুরু এবং শান্তিদাতা সুহৃৎ। কেমন দেখ আজ আমাদের উপরে তিনি প্রসাদবারি বর্ষণ করিতেছেন, এবং সেই মৃতসঞ্জীবনী অমৃত বারি সকলে মিলিয়া একত্রে উপভোগ করিয়া কেমন আজ আমরা আনন্দে পরিপ্লুত হইতেছি।

যাঁহার নিত্য পূজা মহোৎসবে নিখিল গগন-মণ্ডল নৈবেদ্য-ভরা থাল এবং চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র আরতির প্রদীপ—কি দিয়া আজ আমরা তাঁহার পূজার্চ্চনা করিব? দীন হৃদয়ের শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতিই আমাদের একমাত্র সম্বল এবং মঙ্গলময় বিশ্বপিতা পরমেশ্বরের অপার করুণাই আমাদের একমাত্র ভরসা। বিজ্ঞানের পরীক্ষিত সিদ্ধান্ত যদি সত্য হয়, তবে এই যে ক্ষণস্থায়ী দীপালোক যাহাকে আমরা পার্থিব-বোধে হেয়জ্ঞান করিতেছি তাহা মহামহিমান্বিত দ্যুলোকেরই-আলোক। এই যে ক্ষুদ্র গৃহপ্রাঙ্গণ যাহাতে ভগবৎপ্রেমপিপাসু ভক্তবৃন্দের জন্য স্থান-সংকুলন হওয়া দুর্ঘট, এই ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণের ধরণী শক্তি সসাগরা পৃথিবীরই ধরণী শক্তি। জ্ঞানের আলোকে এই ক্ষুদ্র দীপালোকই মহৎ সূর্য্যলোক; হৃদয়ের প্রীতিতে এই ক্ষুদ্র গৃহপ্রাঙ্গণই বৃহৎব্রহ্মাণ্ড।

আমাদিগকে তীর্থপর্য্যটনের প্রয়াস পাইতে হইবে না; এইখানেই—এই পুরাতন জীর্ণ সদনেই—আমাদের পরমারাধ্য পরম দেবতা পরমাত্মা বিশ্বব্যাপী মহিমার সহিত বিরাজমান। জ্ঞান-নেত্র উন্মীলন কর, দেখিতে পাইবে। প্রীতিভক্তি সহকারে হৃদয়দ্বার খুলিয়া দেও, দেখিতে পাইবে যে, ভক্তবৎসল পতিতপাবন পরমেশ্বর দীনহীন পরাধীন ভারতসন্তানগণের পূজা গ্রহণের জন্য দুঃখরজনী ভেদ করিয়া আপনাকে প্রকাশ করিতেছেন। আমরা ক্ষুদ্র, আমাদের শরীরমন-আত্মাতে বল নাই, আমাদের দেশ দীন দরিদ্র, আমাদের নিজের কিছুই নাই, আমাদিগকে দেখিবার কেহই নাই; আমাদের বল-ভরসা, সহায়-সম্পত্তি এবং আনন্দ সকলই একমাত্র পরমাত্মা। এই যে ক্ষুদ্র আত্মা জীবাত্মা—পরমাত্মা এই ক্ষুদ্র আত্মারই মহান্ আত্মা। জীবাত্মা যতই ক্ষুদ্র হউক্ না কেন—সেই ক্ষুদ্রের সঙ্গে মহান্ অবিচ্ছেদ্য প্রেমবন্ধনে সম্বদ্ধ। ক্ষুদ্র জীবাত্মা না থাকিলে—ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া কে তাঁহাকে মহান্ বলিয়া সম্বোধন করিবে? এবং কৃপাবারি বর্ষণ করিয়া কাহার তিনি দুঃখ তাপ হরণ করিবেন? পূর্ব্বতন আচার্য্যেরা কেমন দেখ অকৃত্রিম হৃদয়ে বলিয়াছেন—

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে

তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি।
সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ।"

দুইটি সুন্দর পক্ষযুক্ত পক্ষী এক বৃক্ষ অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে, পক্ষী দুটি যুগলে বাঁধা সখা। দুটির একটি স্বাদুফল খাই-তেছে আর-একটি না খাইয়া দেখিতেছে। পক্ষী-দুটি যদিচ একই বৃক্ষে একত্রে মিলিত হইয়া রহিয়াছে, তথাপি একটি শক্তি-অভাবে শোকে মুহ্যমান। তাহার সম্ভজ-নীয় অন্যটিকে দেখিয়া যখন দেখিতে পায় যে তিনিই ইহার মহিমা তখন শোক হইতে মুক্তি লাভ করে। এই যে উক্ত হইয়াছে "দুইটি সুন্দর পক্ষযুক্ত পক্ষী যুগলে বাঁধা সখা" এদুটি পক্ষী জীবাত্মা-পরমাত্মা তাহা বুঝিতেই পারা যাইতেছে। পক্ষযুক্ত বলি-বার তাৎপর্য্য কি তাহাও বুঝিতে পারা যাইতেছে। পক্ষীর পক্ষ এক প্রকার বাহু, আর বাহু শক্তিরই প্রতিমা। পক্ষযুক্ত কিনা শক্তিবিশিষ্ট। সুন্দর পক্ষ কেন? না যেহেতু আত্মার সৌন্দর্য্য আত্মশক্তিরই স্ফূর্ত্তি। আত্মশক্তি হইতে যে সকল গুণ এবং কার্য্য স্বতঃ অভিব্যক্ত হয় তাহা সৌ-ন্দর্য্যে পরিপূর্ণ। ইহার পরে যাহা উক্ত হইয়াছে তাহাতে বুঝাইতেছে এই যে জীবাত্মা নিজে শক্তিহীন হইলেও পরমাত্মার শক্তিতে শক্তিমান্ এবং পরমাত্মার মহিমায় মহিমান্বিত, জীবাত্মা স্বাদু অতি স্বাদু ফল খাইতেছে অর্থাৎ সুখসম্পদ্ ভোগ করিতেছে কিন্তু "অনীশঃ" শক্তিহীন। পরমাত্মা ঈশঃ সর্ব্বশক্তিমান্ কিন্তু অনশ্নন্নভিচাক-শীতি না খাইয়া দেখিতেছেন। পরমাত্মা স্বয়ং সুখদুঃখে নির্লিপ্ত, কিন্তু তিনি উদাসীন নহেন। তিনি ঈশঃ অর্থাৎ তিনি জীবাত্মার শক্তিমান্ প্রভু এবং তিনি জীবাত্মাকে দেখিতেছেন। পরমাত্মা জীবাত্মাকে না দেখিলে—শক্তিপ্রদান না করিলে, জীবাত্মা শুদ্ধ কেবল আপনার বলে কিছুই জানিতে পারে না, কিছুই করিতে পারে না। জী-বাত্মা তো স্বাদু ফল ভক্ষণ করিতে সর্ব্বদাই তৎপর তবে তাহার দুঃখ কিসের? "অনী-শয়া" তাহার নিজের হাতে কোনো ক্ষমতা নাই এই তাহার দুঃখ। দুঃখ হইতে মুক্তি লাভ করে কখন্? না জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্য-মীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ আপ-নার যিনি সম্ভজনীয় শক্তিমান্ প্রভু সেই অন্যটিকে দেখিয়া যখন দেখিতে পায় যে, তিনিই ইহার মহিমা তখন দুঃখ শোক হইতে মুক্তি লাভ করে। অর্থাৎ জীবাত্মা আপনি দুর্বল হইলেও যখন দেখিতে পায় যে, পরমাত্মা দুর্ব্বলের বল; আপনি দীন-হীন হইলেও যখন দেখিতে পায় যে, পর-মাত্মা দীন দরিদ্রের ঐশ্বর্য্য; আপনি ক্ষুদ্র হইলেও যখন দেখিতে পায় যে, পরমাত্মা ক্ষুদ্রজনের মহিমা তখন সে দুখ শোক হইতে মুক্তি লাভ করে। ইংরাজি পত্রে রাজার নাম উল্লেখ করিবার সময় রাজার নাম না লিখিয়া লেখা হইয়া থাকে রাজ-মহিমা। এরূপ স্থলে রাজ-মহিমা শব্দের অর্থ রাজার মহিমান্বিত আপনি। তেমনি এই যে একটি কথা বলা হইয়াছে যে, "ইহার মহিমা তিনি" একথার অর্থ এই যে, পরমাত্মা জীবাত্মার মহিমান্বিত দ্বিতীয় আত্মা অথবা অভাবান্বিত জীবাত্মার প্রভাবান্বিত দ্বিতীয় আত্মা। জীবাত্মা দীন হীন মলিন এবং দুর্ব্বল হইলেও তাহার দৈন্য এবং ক্ষুদ্রতা ঘুচিয়া যায় যখন সে দেখিতে পায় যে, তাহার যিনি দ্বিতীয় আত্মা পরমাত্মা তিনি মহামহিমান্বিত এবং সর্ব্বশক্তিমান্। আমি যে সময়ে অরণ্যে পথ হারাইয়া শক্তি-অভাবে শোকে তাপে মুহ্যমান সেই সময়ে মনে কর যেন আমি সহসা চক্ষু উন্মীলন

করিয়া আমার একজন শক্তিমান্ মঙ্গলেচ্ছু প্রিয়বন্ধুকে সম্মুখে দেখিলাম। আমার চক্ষুর চিত্রপটে তাঁহার মুখচ্ছবি যাহা নিপতিত হইল তাহা আমার শরীরেরই অন্তর্ভূত; সেই ছবিখানিতে আমার মনোবৃত্তি তন্ময়ীভূত হইল; আর সেই সঙ্গে আমি সেই ছবিখানির মধ্য দিয়া আমার সেই বন্ধু'র অভয়প্রদ মূর্ত্তি সম্মুখে প্রত্যক্ষ করিলাম। কিন্তু তাঁহার আত্মাকে সেরূপে সম্মুখে প্রত্যক্ষ দেখা চক্ষুদ্বারা সম্ভাবনীয় নহে—তাঁহার আত্মাকে আমি আমার এই আত্মাতেই দ্বিতীয় আত্মারূপে উপলব্ধি করিলাম। একাকী আপনিমাত্র আমার এই যে আত্মা এ আত্মা অরণ্যে পথ হারাইয়া চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতেছিল, ইতিমধ্যে যখন আমার সেই বন্ধুর মঙ্গলেচ্ছাপরিপূর্ণ প্রফুল্ল বদন আমার চক্ষের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া আমার মুমূর্ষু আত্মাতে আনন্দ এবং আশা জাগাইয়া তুলিল, তখন আর আমার আত্মা একাকী রহিল না, তখন আমি এই আত্মাতেই আমার সেই বন্ধুর আত্মাকে মহত্তর দ্বিতীয় আত্মারূপে উপলব্ধি করিয়া অভয় প্রাপ্ত হইলাম। তেমনি, একাকী আসিয়াছে, একাকী পথ হারাইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, এবং একাকী যাইবে এই যে জীবাত্মা, এ আত্মা যখন ভক্তিপূর্ণ অন্তঃকরণে পরমাত্মাকে মহামহিমান্বিত দ্বিতীয় আত্মা রূপে উপলব্ধি করে, তখন আনন্দের অক্ষয় খনি হস্তে পাইয়া দুঃখ শোক হইতে মুক্ত হয়।

সাধক যখন পরমাত্মাকে সর্ব্বভূতে দেখেন, তখনও তিনি তাঁহাকে আত্মাতে দ্বিতীয় আত্মারূপে উপলব্ধি করেন; যখন তাঁহাকে প্রত্যেক বস্তুতে এবং প্রত্যেক ঘটনাতে দেখেন তখনও তাই; যখন তিনি ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহাকে সকাতরে ডাকেন তখনও তাই; আবার যখন তিনি চক্ষু মুদিত করিয়া বেদমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক তাঁহাকে ধ্যানে দর্শন করেন, তখনও তাই। ভক্তিমান্ সাধক পরমাত্মাকে যখন যেরূপে ভাবনা করেন বা দর্শন করেন তখনই তাঁহাকে মহিমান্বিত দ্বিতীয় আত্মারূপে অন্তরে উপলব্ধি করেন। আত্মাকে ছাড়িয়া কেহই পরমাত্মাকে উপলব্ধি করিতে পারে না, আর, পরমাত্মাকে ছাড়িয়া কেহই আত্মার সহায়সামর্থ্য আশাভরসা এবং আনন্দের দ্বিতীয় প্রস্রবণ খুঁজিয়া পাইতে পারে না। পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার যখন এইরূপ অব্যবহিত-ভাবের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ; বিশ্বভুবনের অধিদেবতা যখন ক্ষুদ্র কুটীরের অধিদেবতা; মহতোমহীয়ান্ পরমাত্মা যখন অণোরণীয়ান্ জীবাত্মার দ্বিতীয় আত্মা, তখন আমাদের কি দুঃখ, কি মোহ, কি ভয়! অতএব আনন্দিত হও! এবং আনন্দের যিনি অমৃত প্রস্রবণ—আজিকের এই মাঘোৎসবের শুভ সায়ংকালে সকলে মিলিয়া একত্রে শ্রদ্ধা ভক্তি এবং প্রীতির সহিত তাঁহার আরাধনা করিয়া দুঃখ শোকের মর্ম্মনিপীড়ক বার্ত্তা সকল ক্ষণকালের জন্য বিস্মৃত হইয়া যাও। অদ্যকার মতো এরূপ সুনির্ম্মল শান্তি এবং আনন্দসম্ভোগের শুভ মুহূর্ত্ত অতীব বিরল। অতএব এই বেলা নিখিলবিশ্বের জনকজননী পরম করুণাময় পরমাত্মার প্রসাদামৃত-বারি হৃদয় ভরিয়া পান কর। কিয়ৎক্ষণ পরে যখন এই জনপূর্ণ উৎসব-ক্ষেত্র নির্জ্জনে পরিণত হইবে তখন যাহাতে আমরা প্রতিজনে আপনার মহিমান্বিত দ্বিতীয় আত্মা পরমাত্মাকে সঙ্গে পাইয়া অদীনসত্ত্ব এবং কৃতকৃতার্থ হইয়া অনুপম আনন্দে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারি, এই বেলা তাহার পাথেয় সম্বলের আয়োজনে তৎপর হও।

পরে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিম্নলিখিত প্রকারে সকলকে উদ্বোধিত করিলেন।

বৃষ্টি ত প্রতিদিন হয় না! একদিন গুরুবর্ষণ হইয়া গেলে বহুদিনের শুষ্কতার মধ্যেও কৃষিকার্য্য সম্পন্ন হইতে থাকে। আজ আমরা সেই গুরুবর্ষণের প্রত্যাশী। আমাদের সংসারকে সত্যে সৌন্দর্য্যে মঙ্গলে নবীন ও সফল করিবার জন্য যে রসের প্রয়োজন সে রস ত আমরা প্রতিদিন পাই না—সংসারের মাটি তপ্ত হইয়া উঠে, কঠিন হইয়া উঠে। তাই অন্তত একদিন স্বর্গ হইতে রসবর্ষণ চাই যে রস বহুদিনকে সার্থক করিবে। আজ যদি আমরা সম্মিলিত চিত্তে একান্ত মনে সেই প্রার্থনা করিতে পারি তবে ব্রহ্মলোক হইতে প্রসাদধারা বিগলিত হইয়া পড়িবে।

অতএব এই মুহূর্ত্তে একবার আমাদের হৃদয়ে হৃদয় মিলিত হউক্—একবার এই বৃহৎ জনতার সকলের এক চিত্ত তৃষার্ত্তের রিক্ত জলপাত্রের ন্যায় ঊর্দ্ধলোকে উৎথাপিত হউক্, অমৃতের জন্য নীরবে ভক্তিনম্র মস্তকে প্রতীক্ষা করিয়া থাকি। উৎসবের দিনে আজ ত বিষয়চিন্তার দিন নয়, আজ ত পরস্পর পৃথক্ থাকিয়া নিজ নিজ স্বার্থ-সাধন করিবার দিন নয়—আজ যখন ব্রহ্মের নাম লইয়া সকলে মিলিবার অবকাশ করিয়া লইয়াছি তখন এই অবকাশকে যেন সামান্য কৌতূহল তৃপ্তি দ্বারা বিক্ষিপ্ত করিয়া না ফেলি। এই মুহূর্ত্তে জননীর পদ্মহস্তের ন্যায় পরম শান্তি আমাদের তপ্ত ললাটের উপরে অবতীর্ণ হউক্—এখনি আমাদের এই জনতার উপরে সেই প্রসন্ন মুখচ্ছবির প্রসাদ-দৃষ্টি স্নিগ্ধ জ্যোতিতে বিকীর্ণ হউক্—বিক্ষিপ্ত চিত্তকে সংসারের চতুর্দ্দিক হইতে আজ জননীর এই উৎসব-ভাণ্ডার-দ্বারে ডাক দিয়া আনি, ওরে অশান্ত, আজ হৃদয়কে আর দূরে ছড়াইয়া রাখিয়ো না, ওরে উন্মত্ত, আজ আপনাকে আর দিগ্বিদিকে হারাইয়া ফেলিয়ো না, ওরে আত্মবিস্মৃত, আজ একবার আত্মাকে জগদন্তরাত্মার মাঝখানে রাখিয়া আত্মপরিচয় লাভ করিয়া লও। শুভযোগ কখন্ উপস্থিত হয় কেহ জানি না—কেমন করিয়া বলিব আজ আমাদের কেহই ক্ষণকালের সুযোগে চিরকালের সার্থকতা লাভ করিয়া যাইব কি না। আজ আমারা যখন গৃহে ফিরিব তখন কি আমাদের সকলেরই হৃদয় শুষ্ক থাকিবে? কাহারো কি পাত্র পূর্ণ হইবে না? একবার আমরা শান্ত হইয়া, স্তব্ধ হইয়া, একাগ্রচিত্তে প্রতীক্ষা করি, তাহার পরে যখন মুখ তুলিয়া চাহিব তখন কি আমাদের মধ্যে কেহ দেখিব না আমাদের কঠিন প্রস্তরাকীর্ণ শুষ্ক হৃদয় নদী পথে অগম গিরিশিখর হইতে ধারা নামিয়াছে, দুই কূল কাণায় কাণায় ভরিয়া উঠিয়াছে—বহুদিনের নিঃশব্দ শূন্যতা আজ আনন্দকলগানে ধ্বনিত? সেই মহাবকাশের কাল আসিয়াছে এই কথা একবার আমরা স্তব্ধচিত্তে স্মরণ করি—এই মহাক্ষণকে আমরা যোড়হস্তে নীরবে আবাহন করিয়া লই—আমাদের অদ্যকার উৎসব দিন আমাদের অবশিষ্ট জীবনের মধ্যে সফল হউক্!

পরে উপাসনাদি সমাপ্ত হইলে রবীন্দ্র বাবু এই উপদেশ দিলেন।

সূর্য্য অস্ত গিয়াছে। অন্ধকার অবগুণ্ঠনের অন্তরালে সন্ধ্যার সীমন্তের শেষ স্বর্ণলেখাটুকু অন্তর্হিত হইয়াছে। রাত্রিকাল আসন্ন।

এই রাত্রিই মিলনের প্রকৃত সময়—উৎসবের আনন্দ এখনই ঘনীভূত হইতে থাকে।

এই আনন্দরজনীর আরম্ভকালে আমা-

দের উৎসবদেবতাকে প্রণাম করিয়া মনকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছি এই যে, দিন এবং রাত্রি প্রত্যহই আমাদের জীবনকে একবার আলোকে একবার অন্ধকারে তালে তালে আঘাত করিয়া যাইতেছে—ইহারা আমাদের চিত্তবীণায় কি রাগিণী ধ্বনিত করিয়া তুলিতেছে? এইরূপে প্রতিদিন আমাদের মধ্যে যে এক অপরূপ ছন্দ রচিত হইতেছে, তাহার মধ্যে কি কোন বৃহৎ অর্থ নাই? আমরা এই যে অনন্ত গগনতলের নাড়ি স্পন্দনের ন্যায় দিনরাত্রির নিয়মিত উত্থান-পতনের অভিঘাতের মধ্যে বাড়িয়া উঠিতেছি, আমাদের জীবনের মধ্যে এই আলোক-অন্ধকারের নিত্য গতিবিধির একটা তাৎপর্য্য কি গ্রথিত হইয়া যাইতেছে না? তটভূমির উপরে প্রতি বর্ষায় যে একটা জলপ্লাবন বহিয়া যাইতেছে এবং তাহার পরে শরৎকালে সে আবার জল হইতে জাগিয়া উঠিয়া শস্য-বপনের জন্য প্রস্তুত হইতেছে—এই বর্ষা ও শরতের গতায়াত তটভূমির স্তরে স্তরে কি নিজের ইতিহাস রাখিয়া যায় না?

দিনের পর এই যে রাত্রির অবতরণ, রাত্রির পর এই যে দিনের অভ্যুদয়, ইহার পরম বিস্ময়করতা হইতে আমরা চিরাভ্যাস-বশত যেন বঞ্চিত না হই! সূর্য্য একসময়ে হঠাৎ আকাশতলে তাহার আলোকের পুঁথি বন্ধ করিয়া-দিয়া চলিয়া যায়—রাত্রি নিঃশব্দ-করে আর-একটি নূতন গ্রন্থের নূতন অধ্যায় বিশ্বলোকের সহস্র অনিমেষনেত্রের সম্মুখে উদ্ঘাটিত করিয়া দেয়, ইহা আমাদের পক্ষে সামান্য ব্যাপার নহে।

এই অল্পকালের পরিবর্ত্তন কি বিপুল, কি আশ্চর্য্য! কি অনায়াসে মুহূর্ত্ত কালের মধ্যেই বিশ্বসংসার ভাব হইতে ভাবান্তরে পদার্পণ করে! অথচ মাঝখানে কোন বিপ্লব নাই, বিচ্ছেদের কোনো তীব্র আঘাত নাই, একের অবসান ও অন্যের আরম্ভের মধ্যে কি স্নিগ্ধ শান্তি, কি সৌম্য সৌন্দর্য্য!

দিনের আলোকে, সকল পদার্থের পরস্পরের যে প্রভেদ, যে পার্থক্য, তাহাই বড় হইয়া, স্পষ্ট হইয়া, আমাদের প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে। আলোক আমাদের পরস্পরের মধ্যে একটা ব্যবধানের কাজ করে—আমাদের প্রত্যেকের সীমা পরিস্ফুটরূপে নির্ণয় করিয়া দেয়। দিনের বেলায় আমরা যে-যার আপন-আপন কাজের দ্বারা স্বতন্ত্র, সেই কাজের চেষ্টার সংঘাতে পরস্পরের মধ্যে বিরোধও বাধিয়া যায়। দিনে আমরা সকলই নিজ নিজ শক্তি প্রয়োগ করিয়া জগতে নিজেকে জয়ী করিবার চেষ্টায় নিযুক্ত। তখন আমাদের আপন-আপন কর্ম্মশালাই আমাদের কাছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আর-সমস্ত বৃহৎ ব্যাপারের চেয়ে বৃহত্তম—এবং নিজ নিজ কর্ম্মোদ্যোগের আকর্ষণই জগতের আর-সমস্ত মহৎ আকর্ষণের চেয়ে আমাদের কাছে মহত্তম হইয়া উঠে।

এমন-সময় নীলাম্বরা রাত্রি নিঃশব্দপদে আসিয়া নিখিলের উপরে স্নিগ্ধ করস্পর্শ করিবামাত্র আমাদের পরস্পরের বাহ্য প্রভেদ অস্পষ্ট হইয়া আসে—তখন আমাদের পরস্পরের মধ্যে গভীরতম যে ঐক্য, তাহাই অন্তরের মধ্যে অনুভব করিবার অবকাশ ঘটে। এই জন্য রাত্রি প্রেমের সময়, মিলনের কাল।

ইহাই ঠিক করিয়া বুঝিতে পারিলে জানিব—দিন আমাদিগকে যাহা দেয়, রাত্রি শুদ্ধমাত্র যে তাহা অপহরণ করে, তাহা নহে অন্ধকার যে কেবলমাত্র অভাব ও শূন্যতা আনয়ন করে, তাহা নহে—তাহারও দিবার জিনিষ আছে এবং যাহা দেয়, তাহা মহামূল্য। সে যে কেবল সুপ্তির দ্বারা আমাদের ক্ষতি পূরণ করে,—আমাদের ক্লান্তি অপনোদন করিয়া দেয় মাত্র, তাহা নহে। সে আমা-

দের প্রেমের নিভৃত নির্ভরস্থান; সে আমাদের মিলনের মহাদেশ।

শক্তিতে আমাদের গতি, প্রেমে আমাদের স্থিতি। শক্তি কর্ম্মের মধ্যে আপনাকে ধাবিত করে, প্রেম বিশ্রামের মধ্যে আপনাকে পুঞ্জীভূত করে। শক্তি আপনাকে বিক্ষিপ্ত করিতে থাকে—সে চঞ্চল, প্রেম আপনাকে সংহত করিয়া আনে—সে স্থির। আমাদের চিত্ত যাহাদিগকে ভালবাসে, সংসারে কেবল তাহাদেরই মধ্যে সে বিরামলাভ করে, আমাদের চিত্ত যখন বিশ্রামের অবকাশ পায়, তখনই সে সম্পূর্ণ ভাবে ভালবাসিতে পারে। জগতে আমাদের যথার্থ যে বিরাম, তাহা প্রেম;—প্রেমহীন যে বিরাম, তাহা জড়ত্বমাত্র।

এই কারণে কর্ম্মশালা প্রকৃত মিলনের স্থান নহে, স্বার্থে আমরা একত্র হইতে পারি, কিন্তু এক হইতে পারি না। প্রভুভৃত্যের মিলন সম্পূর্ণ মিলন নহে, বন্ধুদের মিলনই সম্পূর্ণ। বন্ধুত্বের মিলন বিশ্রামের মধ্যে বিকশিত হয়—তাহাতে কর্ম্মের তাড়না নাই, তাহাতে প্রয়োজনের বাধ্যতা নাই। তাহা অহেতুক।

এইজন্য দিবাবসানে আমাদের প্রয়োজন যখন শেষ হয়, আমাদের কর্ম্মের বেগ যখন শান্ত হয়, তখনই সমস্ত আবশ্যকের অতীত যে প্রেম, সে আপনার যথার্থ অবকাশ পায়। আমাদের কর্ম্মের সহায় যে ইন্দ্রিয়বোধ, সে যখন অন্ধকারে আবৃত হইয়া পড়ে, তখন ব্যাঘাতহীন আমাদের হৃদয়ের শক্তি বাড়িয়া উঠে, তখন আমাদের স্নেহপ্রেম সহজ হয়—আমাদের মিলন সম্পূর্ণ হয়।

তাই বলিতেছিলাম, রাত্রি যে কেবল হরণ করে, তাহা নহে, সে দানও করে। আমাদের এক যায়, আমরা আর পাই; এবং যায় বলিয়াই আমরা তাহা পাইতে পারি। দিনে সংসারক্ষেত্রে আমাদের শক্তিপ্রয়োগের সুখ, রাত্রে তাহা অভিভূত হয় বলিয়াই নিখিলের মধ্যে আমরা আত্মসমর্পণের আনন্দ পাই। দিনে স্বার্থসাধনচেষ্টায় আমাদের কর্তৃত্ব-অভিমান তৃপ্ত হয়, রাত্রি তাহাকে খর্ব্ব করে বলিয়াই প্রেম এবং শান্তির অধিকার লাভ করি। দিনে আলোকে-পরিচ্ছিন্ন এই পৃথিবীকে আমরা উজ্জ্বলরূপে পাই, রাত্রে তাহা ম্লান হয় বলিয়াই অগণ্য জ্যোতিষ্কলোক উদ্ঘাটিত হইয়া যায়।

আমরা একই সময়ে সীমাকে এবং অসীমকে, অহংকে এবং অখিলকে, বিচিত্রকে এবং এককে সম্পূর্ণভাবে পাইতে পারি না বলিয়াই একবার দিন আসিয়া আমাদের চক্ষু খুলিয়া দেয়, একবার রাত্রি আসিয়া আমাদের হৃদয়ের দ্বার উদ্ঘাটিত করে। একবার আলোক আসিয়া আমাদিগকে কেন্দ্রের মধ্যে নিবিষ্ট করে, একবার অন্ধকার আসিয়া আমাদিগকে পরিধির সহিত পরিচিত করিতে থাকে।

এইজন্য রাত্রি উৎসবের বিশেষ সময়। এখন বিশ্বভুবন অন্ধকারের মাতৃকক্ষে আসিয়া সমবেত হইয়াছে। যে অন্ধকার হইতে জগৎচরাচর ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, যে অন্ধকার হইতে আলোকনির্ঝরিণী নিরন্তর উৎসারিত হইতেছে, যেখানে বিশ্বের সমস্ত উদ্যোগ নিঃশব্দে শক্তিসঞ্চয় করিতেছে, সমস্ত ক্লান্তি সুপ্তিসুধার মধ্যে নিমগ্ন হইয়া নবজীবনের জন্য প্রস্তুত হইতেছে, যে নিস্তব্ধ মহান্ধকারগর্ভ হইতে একএকটি উজ্জ্বল দিবস নীলসমুদ্র হইতে একএকটি ফেনিল তরঙ্গের ন্যায় একবার আকাশে উত্থিত হইয়া আবার সেই সমুদ্রের মধ্যে শয়ান হইতেছে, সেই অন্ধকার আমাদের নিকট

যাহা গোপন করিতেছে, তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক প্রকাশ করিতেছে। সে না থাকিলে লোকলোকান্তরের বার্ত্তা আমরা পাইতাম না, আলোক আমাদিগকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিত।

এই রজনীর অন্ধকার প্রত্যহ একবার করিয়া দিবালোকের স্বর্ণসিংহদ্বার মুক্ত করিয়া আমাদিগকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অন্তঃপুরের মধ্যে আনিয়া উপস্থিত করে, বিশ্বজননীর এক অখণ্ড নীলাঞ্চল আমাদের সকলের উপরে টানিয়া দেয়। সন্তান যখন মাতার আলিঙ্গন-পাশের মধ্যে সম্পূর্ণ প্রচ্ছন্ন হইয়া কিছুই দেখে না—শোনে না, তখনই নিবিড়তর ভাবে মাতাকে অনুভব করে—সেই অনুভূতি দেখা-শোনার চেয়ে অনেক বেশি ঐকান্তিক—স্তব্ধ অন্ধকার তেমনি যখন আমাদের দেখা-শোনাকে শান্ত করিয়া দেয়, তখনই আমরা এক শয্যাতলে নিখিলকে ও নিখিলমাতাকে আমাদের বক্ষের কাছে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে নিকটবর্ত্তী করিয়া অনুভব করি। তখন নিজের অভাব, নিজের শক্তি, নিজের কাজ বাড়িয়া-উঠিয়া আমাদের চারিদিকে প্রাচীর তুলিয়া দেয় না, অত্যুগ্র ভেদবোধ আমাদের প্রত্যেককে খণ্ড-খণ্ড পৃথক্ পৃথক্ করিয়া রাখে না, মহৎ নিঃশব্দতার মধ্য দিয়া নিখিলের নিশ্বাস আমাদের গায়ের উপরে আসিয়া পড়ে, এবং নিত্যজাগ্রত নিখিলজননীর অনিমেষদৃষ্টি আমাদের শিয়রের কাছে প্রত্যক্ষগম্য হইয়া উঠে।

আমাদের রজনীর উৎসব সেই নিভৃতনিগূঢ় অথচ বিশ্বব্যাপী জননীকক্ষের উৎসব। এখন আমরা কাজের কথা ভুলি, সংগ্রামের কথা ভুলি, আত্মশক্তি-অভিমানের চর্চ্চা ভুলি, আমরা সকলে মিলিয়া তাঁহার প্রসন্ন মুখচ্ছবির ভিখারী হইয়া দাঁড়াই—বলি, জননি, যখন প্রয়োজন ছিল, তখন তোমার কাছে ক্ষুধার অন্ন কর্ম্মের শক্তি, পথের পাথেয় প্রার্থনা করিয়াছিলাম—কিন্তু এখন সমস্ত প্রয়োজনকে বাহিরে ফেলিয়া আসিয়া তোমার এই কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছি, এখন একান্ত তোমাকেই প্রার্থনা করি। আমি তোমার কাছে এখন আর হাত পাতিব না—কেবলমাত্র তুমি আমাকে স্পর্শ কর, মার্জ্জনা কর, গ্রহণ কর! তোমার রজনী-মহাসমুদ্রে অবগাহন-স্নান করিয়া বিশ্বজগৎ যখন কাল উজ্জ্বলবেশে নির্ম্মল ললাটে প্রভাত আলোকে দণ্ডায়মান হইবে, তখন যেন আমি তাহার সঙ্গে সমান হইয়া দাঁড়াইতে পারি—তখন যেন আমার গ্লানি না থাকে, আমার ক্লান্তি দূর হয়—তখন যেন আমি অন্তরের সহিত বলিতে পারি—সকলের কল্যাণ হউক, কল্যাণ হউক্, যেন বলিতে পারি—সকলের মধ্যে যিনি আছেন, তাঁহাকে আমি দেখিতেছি,—তাঁহার যাহা প্রসাদ, তিনি অদ্য সমস্ত দিন আমাকে যাহা দিবেন, তাহাই আমি ভোগ করিব, আমি কিছুতেই লোভ করিব না।

প্রাতঃকালে যিনি আমাদের পিতা হইয়া আমাদিগকে কর্ম্মশালায় প্রেরণ করিয়াছিলেন, সন্ধ্যাকালে তিনিই আমাদের মাতা হইয়া আমাদিগকে তাঁহার অন্তঃপুরে আকর্ষণ করিয়া লইতেছেন! প্রাতঃকালে তিনি আমাদিগকে ভার দিয়াছিলেন, সন্ধ্যাকালে তিনি আমাদের ভার লইতেছেন। প্রত্যহই দিনে-রাত্রে এই যে দুই বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে আমাদের জীবন আন্দোলিত হইতেছে—একবার পিতা আমাদিগকে বহির্দ্দেশে পাঠাইতেছেন, একবার মাতা আমাদিগকে অন্তঃপুরে টানিতেছেন, একবার নিজের দিকে ধাবিত হইতেছি, একবার অখিলের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন

করিতেছি ইহার মধ্যে আমাদের জীবন ও মৃত্যুর গভীর রহস্যচ্ছবি আলোক-অন্ধকারের তুলিকাপাতে প্রতিদিন চিত্রিত হইতেছে।

আমাদের কাব্যে-গানে আয়ু-অবসানের সহিত আমরা দিনান্তের উপমা দিয়া থাকি—কিন্তু সকল সময়ে তাহার সম্পূর্ণ ভাবটি আমরা হৃদয়ঙ্গম করি না, আমরা কেবল অবসানেরই দিক্‌টা দেখিয়া বিষাদের নিশ্বাস ফেলি—পরিপূরণের দিক্‌টা দেখি না। আমরা ইহা ভাবিয়া দেখি না, প্রত্যহ দিবাবসানে এত-বড় যে একটা বিপরীত ব্যাপার ঘটিতেছে, আমাদের শক্তির যে এমন-একটা বিপর্য্যয়দশা উপস্থিত হইতেছে, তাহাতে ত কিছুই বিশ্লিষ্ট হইয়া যাইতেছে না, জগৎ জুড়িয়া ত হাহাকারধ্বনি উঠিতেছে না, মহাকাশতলে বিশ্বের আরামেরই নিশ্বাস পড়িতেছে।

দিবস আমাদের জীবনেরই প্রতিকৃতি বটে। দিনের আলোক যেমন আর-সমস্ত লোককে আবৃত করিয়া আমাদের কর্ম্মস্থান এই পৃথিবীকেই একমাত্র জাজ্বল্যমান করিয়া তুলে—আমাদের জীবনও আমাদের চতুর্দ্দিকে তেমনি একটি বেষ্টন রচনা করে,—সেই জন্যই আমাদের জীবনের অন্তর্গত যাহা-কিছু, তাহাই আমাদের কাছে এত একান্ত, ইহার চেয়ে বড় যে আর-কিছু আছে, তাহা সহসা আমাদের মনেই হয় না। দিনের বেলাতেও ত আকাশ ভরিয়া জ্যোতিষ্কলোক বিরাজ করিতেছে, কিন্তু দেখিতে পাই কই? যে আলোক আমাদের কর্ম্মস্থানের ভিতরে জ্বলিতেছে, সেই আলোকই বাহিরের অন্য সমস্তকে দ্বিগুণতর অন্ধকারময় করিয়া রাখে। তেমনি আমাদের এই জীবনকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া শতসহস্র জ্যোতির্ম্ময় বিচিত্র রহস্য নানা আকারে বিরাজ করিতেছে, কিন্তু আমরা দেখিতে পাই কই? যে চেতনা, যে বুদ্ধি, যে ইন্দ্রিয়শক্তি আমাদের জীবনের পথকে উজ্জ্বল করে, আমাদের কর্ম্মসাধনেরই পরিধিসীমার মধ্যে আমাদের মনোযোগকে প্রবল করিয়া তোলে, সেই জ্যোতিই আমাদের জীবনের বহিঃসীমার সমস্তই আমাদের নিকটে অগোচর রাখিয়া দেয়।

জীবনে যখন আমরাই কর্ত্তা, যখন সংসারই সর্ব্বপ্রধান, যখন আমাদের সুখ-দুঃখচক্রের পরিধি আমাদের আয়ুকালের মধ্যেই বিশেষভাবে পরিচ্ছিন্ন বলিয়া প্রতিভাত হইতে থাকে, এমন-সময় দিন অবসান হইয়া যায়, জীবনের সূর্য্য অস্তাচলের অন্তরালে গিয়া পড়ে, মৃত্যু আমাদিগকে অঞ্চলে আচ্ছন্ন করিয়া কোলে তুলিয়া লয়। তখন সেই-যে অন্ধকারের আবরণ, সে কি কেবলি অভাব, কেবলি শূন্যতা? আমাদের কাছে কি তাহার একটি সুগভীর ও সুবিপুল প্রকাশ নাই? আমাদের জীবনাকাশের অন্তরালে যে অসীমতা নিত্যকাল বিরাজ করিতেছে, মৃত্যুর তিমিরপটে তাহা কি দেখিতে দেখিতে আমাদের চতুর্দ্দিকে আবিষ্কৃত হইয়া পড়ে না? তখন কি সহসা আমাদের এই সীমাবচ্ছিন্ন জীবনকে অসংখ্য জীবনলোকের সহিত যুক্ত করিয়া দেখিতে পাই না? দিবসের বিচ্ছিন্ন পৃথিবীকে সন্ধ্যাকাশে যখন সমস্ত গ্রহদলের সঙ্গে নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্যে সংযুক্ত করিয়া জানিতে পারি, তখন সমস্তটির যেমন একটি বৃহৎ ছন্দ, একটি প্রকাণ্ড তাৎপর্য্য আমাদের চিত্তের মধ্যে প্রসারিত হইয়া উঠে, তেমনি মৃত্যুর পরে বিশ্বের সহিত যোগযুক্ত আমাদের জীবনের বিপুল তাৎপর্য্য কি আমাদের কাছে অতি সহজেই প্রকাশিত হয় না? জীবিতকালে যাহাকে আমরা একক

করিয়া—পৃথক্ করিয়া দেখি, মৃত্যুর পরে তাহাকেই আমরা বিরাটের মধ্যে সম্পূর্ণ করিয়া দেখিবার অবকাশ পাই। আমাদের জীবনের চেষ্টা, আমাদের জীবিকার সংগ্রাম যখন ক্ষান্ত হইয়া যায়, তখন সেই গভীর নিস্তব্ধতায় আমরা আপনাকে অসীমেরই মধ্যে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাই, নিজের ব্যক্তিগত সীমার মধ্যে নহে।

এইরূপে জীবন হইতে মৃত্যুতে পদার্পণ দিন হইতে রাত্রিতে সংক্রমণেরই অনুরূপ। ইহা বাহির হইতে অন্তঃপুরে প্রবেশ—কর্ম্মশালা হইতে মাতৃক্রোড়ে আত্মসমর্পণ—পরস্পরের সহিত পার্থক্য ও বিরোধ হইতে নিখিলের সহিত মিলনের মধ্যে আত্মানুভূতি।

শক্তি আপনাকে ঘোষণা করে, প্রেম আপনাকে আবৃত রাখে। শক্তির ক্ষেত্র আলোক, প্রেমের ক্ষেত্র অন্ধকার। প্রেম অন্তরালের মধ্য হইতেই পালন করে,—লালন করে, অন্তরালের মধ্যেই আকর্ষণ করিয়া আনে। বিশ্বের সমস্ত ভাণ্ডার বিশ্বজননীর গোপন অন্তঃপুরের মধ্যে। তাই আমরা কিছুই জানি না—কোথা হইতে এই নিঃশেষবিহীন প্রাণের ধারা লোকে লোকে প্রবাহিত হইতেছে, কোথা হইতে এই অনির্ব্বাণ চেতনার আলোক জীবে জীবে জ্বলিয়া উঠিতেছে, কোথা হইতে এই নিত্যসঞ্জীবিত ধীশক্তি চিত্তে চিত্তে জাগ্রত হইতেছে। আমরা জানি না—এই পুরাতন জগতের ক্লান্তি কোথায় দূর হয়, জীর্ণ-জরার ললাটের শিথিল বলিরেখা কোথায় কোন্ অমৃত করস্পর্শে মুছিয়া-গিয়া আবার নবীনতার সৌকুমার্য্য লাভ করে, জানি না—কণা-পরিমাণ বীজের মধ্যে বিপুল বনস্পতির মহাশক্তি কোথায় কেমন করিয়া প্রচ্ছন্ন থাকে। জগতের এই যে আবরণ, যে আবরণের মধ্যে জগতের সমস্ত উদ্যোগ অদৃশ্য হইয়া কাজ করে,—সমস্ত চেষ্টা বিরামলাভ করিয়া যথাকালে নবীভূত হইয়া উঠে, ইহা প্রেমেরই আবরণ। সুপ্তির মধ্যে এই প্রেমই স্তম্ভিত মৃত্যুর মধ্যে এই প্রেমই প্রগাঢ়, অন্ধকারের মধ্যে এই প্রেমই পুঞ্জীকৃত—আলোকের মধ্যে এই প্রেমই চঞ্চল শক্তির পশ্চাতে থাকিয়া অদৃশ্য, জীবনের মধ্যে এই প্রেমই আমাদের কর্ত্তৃত্বের অন্তরালে থাকিয়া প্রতি-মুহূর্ত্তে বলপ্রেরণ, প্রতিমুহূর্ত্তে ক্ষতিপূরণ করিতেছে।

হে মহাতিমিরাবগুণ্ঠিতা রমণীয়া রজনি, তুমি পক্ষিমাতার বিপুল পক্ষপুটের ন্যায় শাবকদিগকে সুকোমল স্নেহাচ্ছাদনে আবৃত করিয়া অবতীর্ণ হইতেছ; তোমার মধ্যে বিশ্বধাত্রীর পরমস্পর্শ নিবিড়ভাবে, নিগূঢ়ভাবে অনুভব করিতে চাহি। তোমার অন্ধকার আমাদের ক্লান্ত ইন্দ্রিয়কে আচ্ছন্ন রাখিয়া আমাদের হৃদয়কে উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিক্—আমাদের শক্তিকে অভিভূত করিয়া আমাদের প্রেমকে উদ্বোধিত করিয়া তুলুক্, আমাদের নিজের কর্ত্তৃত্বপ্রয়োগের অহঙ্কারসুখকে খর্ব্ব করিয়া মাতার আলিঙ্গনপাশে নিঃশেষে আপনাকে বর্জ্জন করিবার আনন্দকেই গরীয়ান করুক্।

হে বিরাম-বিভাবরীর ঈশ্বরী মাতা, হে অন্ধকারের অধিদেবতা, হে সুপ্তির মধ্যে জাগ্রত, হে মৃত্যুর মধ্যে বিরাজমান, তোমার নক্ষত্রদীপিত অঙ্গনতলে তোমার চরণচ্ছায়ায় লুণ্ঠিত হইলাম। আমি এখন আর কোনো ভয় করিব না, কেবল আপন ভার তোমার দ্বারে বিসর্জ্জন দিব; কোনো চিন্তা করিব না, কেবল চিত্তকে তোমার কাছে একান্ত সমর্পণ করিব; কোনো চেষ্টা করিব না, কেবল তোমার ইচ্ছায় আমার ইচ্ছাকে বিলীন করিব; কোনো বিচার করিব না,

কেবল তোমার সেই আনন্দে আমার প্রেমকে নিমগ্ন করিয়া দিব, যে—

"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।"

ঐ দেখিতেছি তোমার মহান্ধকার রূপের মধ্যে বিশ্বভুবনের সমস্ত আলোক-পুঞ্জ কেবল বিন্দু-বিন্দু-জ্যোতীরূপে একত্র সমবেত হইয়াছে। দিনের বেলায় পৃথিবীর ছোট ছোট চাঞ্চল্য, আমাদের নিজকৃত তুচ্ছ আন্দোলন আমাদের কাছে কত বিপুল—বৃহৎ রূপে দেখা দেয়। কিন্তু আকাশের ঐ যে নক্ষত্রসকল, যাহাদের উদ্দাম বেগ আমরা মনে ধারণাই করিতে পারি না, যাহাদের উচ্ছ্বসিত আলোকতরঙ্গের আলোড়ন আমাদের কল্পনাকে পরাস্ত করিয়া দেয়,—তোমার মধ্যে তাহাদের সেই প্রচণ্ড আন্দোলন ত কিছুই নহে, তোমার অন্ধকার বসনাঞ্চলতলে, তোমার অবনত স্থিরদৃষ্টির নিম্নে তাহারা স্তন্যপান-নিরত সুপ্ত শিশুর মত নিশ্চল, নিস্তব্ধ। তোমার বিরাট্ ক্রোড়ে তাহাদের অস্থিরতাও স্থিরত্ব, তাহাদের দুঃসহ তীব্রতেজ মাধুর্য্য-রূপে প্রকাশমান। ইহা দেখিয়া এ রাত্রে আমার তুচ্ছ চাঞ্চল্যের আস্ফালন, আমার ক্ষণিক তেজের অভিমান, আমার ক্ষুদ্র দুঃখের আক্ষেপ, কিছুই আর থাকে না,—তোমার মধ্যে আমি সমস্তই স্থির করিলাম, সমস্ত আবৃত করিলাম, সমস্ত শান্ত করিলাম, তুমি আমাকে গ্রহণ কর—আমাকে রক্ষা কর,—

"যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্।"

আমি এখন তোমার নিকট শক্তি প্রার্থনা করি না, আমাকে প্রেম দাও; আমি সংসারে জয়ী হইতে চাহি না, তোমার নিকট প্রণত হইতে চাই; আমি সুখদুঃখকে অবজ্ঞা করিতে চাহি না, সুখদুঃখকে তোমার মঙ্গল-হস্তের দান বলিয়া বিনয়ে গ্রহণ করিতে চাই। মৃত্যু যখন আমার কর্ম্ম-শালার দ্বারে দাঁড়াইয়া নীরব সঙ্কেতে আহ্বান করিবে, তখন যেন তাহার অনুসরণ করিয়া, জননি, তোমার অন্তঃপুরের শান্তিকক্ষে নিঃশঙ্কহৃদয়ের মধ্যে আমি ক্ষমা লইয়া যাই,—প্রীতি লইয়া যাই,—কল্যাণ লইয়া যাই,—বিরোধের সমস্ত দাহ যেন সেদিন সন্ধ্যাস্নানে জুড়াইয়া যায়, সমস্ত বাসনার পঙ্ক যেন ধৌত হয়, সমস্ত কুটিলতাকে যেন সরল, সমস্ত বিকৃতিকে যেন সংস্কৃত করিয়া যাইতে পারি! যদি সে অবকাশ না ঘটে, যদি ক্ষুদ্রবল নিঃশেষিত হইয়া যায়, তবু তোমার বিশ্ব-বিধানের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিয়া যেন দিন হইতে রাত্রে, জীবন হইতে মৃত্যুতে, আমার অক্ষমতা হইতে তোমার করুণার মধ্যে একান্ত-ভাবে আত্মবিসর্জ্জন করিতে পারি! ইহা যেন মনে রাখি—জীবনকে তুমিই আমার প্রিয় করিয়াছিলে, মরণকেও তুমিই আমার প্রিয় করিবে,—তোমার দক্ষিণহস্তে তুমি আমাকে সংসারে প্রেরণ করিয়াছিলে, তোমার বামহস্তে তুমি আমাকে ক্রোড়ে আকর্ষণ করিয়া লইবে,—তোমার আলোক আমাকে শক্তি দিয়াছিল, তোমার অন্ধকার আমাকে শান্তি দিবে।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

পরে সঙ্গীত হইয়া সভা ভঙ্গ হইল।

নূতন ব্রহ্মসঙ্গীত।

রাগিণী সুরট-জয়জয়ন্তী—তাল ঝাঁপতাল।

বিজন মন-মন্দিরে বিরাজে শিব সুন্দর।
অরূপ সে রূপ হেরি' আনন্দে হও মগন।
ঢালো তাঁর পূত পদে প্রেম-কুসুম-অঞ্জলি,
মিশাও তাহার সাথে ভকতির চন্দন॥

রাগিণী বিহঙ্গড়া—তাল সুরফাঁকতাল।

ব্রহ্ম সনাতন, তুমি হে নিখিল-পালন,
নিখিল-তারণ, নিখিল-জন-মঙ্গল-কারণ।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে কোথায় তব সীমা,
বিশ্বম্ভর বিশ্বেশ্বর পূরণ!
চন্দ্র তপন গ্রহ নক্ষত্র-মণ্ডল সৃজিলে গগনে,
জল স্থল চরাচর সুর নর সবার রাজা;
সকলি তোমা হতে—ধনজন সুখ সম্পদ;
তুমি দীন-শরণ॥

রাগিণী সিন্ধুড়া—তাল চৌতাল।

কেন আনিলে গো এ ঘোর সংসারে,
জগতজননি;
দূর কর ভয়, ভীত যে আমি।
"জ্ঞানে প্রেমে ভক্তি ধরমে তুই রে বৎস
অমৃতের অধিকারী"—ঐ যে শুনি তব
স্নেহ-আশ্বাস-বাণী॥

রাগিণী দেশ-মল্লার—তাল কাওয়ালি।

আমার এ ঘরে, আপনার করে,
গৃহ-দীপখানি জ্বালো হে;
সব দুখ শোক, সার্থক হোক,
লভিয়া তোমারি আলো হে।
কোণে কোণে যত লুকানো আঁধার
মিলাবে ধন্য হ'য়ে।
তোমারি পুণ্য আলোকে বসিয়া
সবারে বাসিব ভালো হে।
পরশমণির প্রদীপ তোমার,
অচপল তার জ্যোতি,
সোনা ক'রে লবে পলকে, আমার
সকল কলঙ্ক কালো।
আমি যত দীপ জ্বালিয়াছি তাহে
শুধু জ্বালা, শুধু কালী।
আমার ঘরের দুয়ারে শিয়রে
তোমারি কিরণ ঢালো হে।

রাগিণী নায়েকী কানাড়া—তাল একতালা।

জীবনে আমার যত আনন্দ
পেয়েছি দিবস রাত
সবার মাঝারে আজিকে তোমারে
স্মরিব জীবন-নাথ।
যে দিন তোমার জগৎ নিরখি,
হরষে পরাণ উঠেছে পুলকি,
সে দিন আমার নয়নে হয়েছে
তোমারি নয়ন পাত;
বারে বারে তুমি আপনার হাতে
স্বাদে সৌরভে গানে
বাহির হইতে পরশ করেছ
অন্তর মাঝখানে।
পিতা মাতা ভ্রাতা সব পরিবার,
মিত্র আমার, পুত্র আমার,
সকলের সাথে প্রবেশি হৃদয়ে
তুমি আছ মোর সাথ।

রাগিণী কানাড়া—তাল কাওয়ালি।

চিত মন তব পদে করিনু সমর্পণ,
এসহে হৃদয়ে হৃদয়-রঞ্জন!
পাপে জরজর, শোকে কাতর,
দেহ অতিশয় শ্রান্ত-ক্লান্ত,
প্রভু দেও হে, দেহ হে, নবজীবন।
তব গুণ-গাথা অনুদিন গাবো,
থাকি' তব সঙ্গে প্রাণ জুড়াবো;
তব আদেশ করি' শিরোধার্য্য,
তব প্রিয় কার্য্য করিব সাধন।

এবারে বেদগান হইতে সমস্ত সঙ্গীত সাধারণের অত্যন্ত প্রীতিকর হইয়াছিল। সঙ্গীত সকলকেই মোহিত করিয়াছিল।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ১৬ই ফাল্গুন রবিবার বর্দ্ধমান ব্রাহ্মসমাজের ত্রিচত্বারিংশ সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে প্রাতঃকালে ৮ ঘটিকার সময় এবং সায়ংকালে ৭ ঘটিকার সময় পরাৎপর পরব্রহ্মের উপাসনা হইবে। ধর্ম্মোৎসাহী মহাত্মারা উপাসনায় যোগদান করিয়া কৃতার্থ করিবেন।

বর্দ্ধমান
১লা ফাল্গুন
১৩১০ সাল।

বশম্বদ
শ্রীযোগেশচন্দ্র সরকার
সম্পাদক।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭৪, পৌষ মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	৫০১।/৩
পূর্ব্বকার স্থিত	...	৫৫৫।৬
সমষ্টি	...	১০৫৬৷৷/৯
ব্যয়	...	৫১৮।৵৯
স্থিত	...	৫৩৮৵০

আয়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত
আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন
এককেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ
৫০০৲
সমাজের ক্যাশে মজুত ৩৮৵০

৫৩৮৵০

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	৩১৫৲

মাসিক দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
৩১০৲

সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রকুমার দাস গুপ্ত
২৲

আনুষ্ঠানিক দান।

৺ পরাণকৃষ্ণ সরকারের শ্রাদ্ধোপলক্ষে প্রাপ্ত
১৲

বেতের পুরাতন ম্যাটিং বিক্রয়
২৲

৩১৫৲

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা		১৭৮৵০
পুস্তকালয়	...	১০৲
যন্ত্রালয়	...	১৫৮।৶৩
সমষ্টি		৫০১।/৩

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	৩৪৬।৵৯
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	১৫৮৵৬
পুস্তকালয়	...	৵০
যন্ত্রালয়	...	১৫৫৮৶৬
সমষ্টি		৫১৮।৵৯

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ শিরোমণি। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
ধনরক্ষক। সম্পাদক।